বাতায়ন

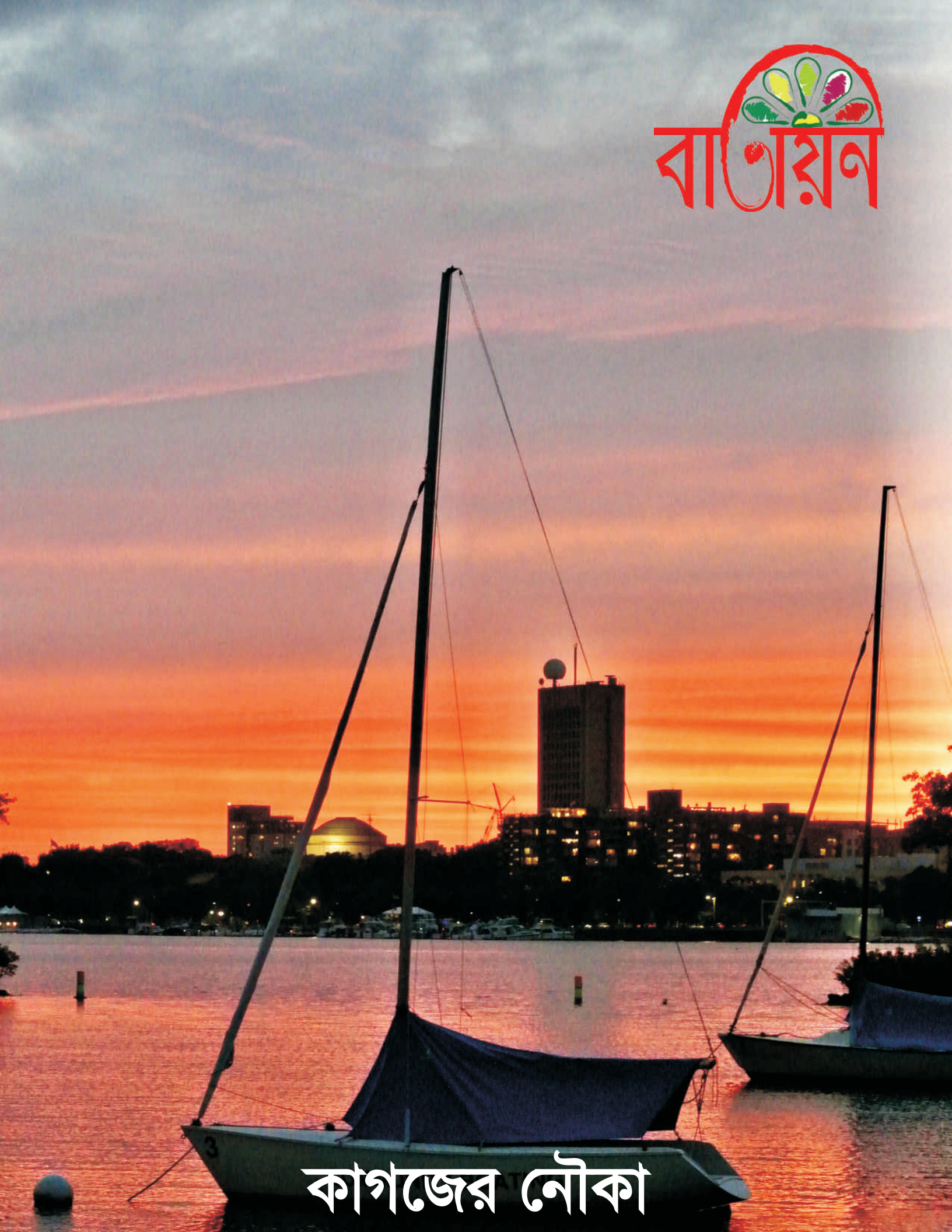

কাগজের নৌকা

প্রতিচ্ছবি

নীল ? সে ভীষণ প্রিয়, ছিল সে জনপ্রিয়,
তোমার প্রতিচ্ছবি জানি,
আকাশ ? সে আজ বলে: "প্রতিচ্ছবিটুকু জলে"
স্মৃতির ছায়াছবি খানি ...

সঞ্জয়

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

২০তম সংখ্যা, জুন ২০২২

সম্পাদনা

সঞ্জয় চক্রবর্তী

বাতায়ন

Issue Number 20 : June 2022

Editor
Sanjoy Chakraborty
Sydney

Group Editor
Ranjita Chattopadhyay
Chicago

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Sydney

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata

Website Design and Support
Susanta Nandi, Kolkata

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Suvra Das **Front Cover**

Shuvra Das is a Professor of Mechanical Engineering and lives in the greater Detroit area. He graduated from IIT Kharagpur in India and finished his PhD from Iowa State University. Photography, painting, writing, theater, and travel are some of his passions. Lately, he has been spending a lot of time in political activism.

Urmi Chakraborty **Inside Front Cover - Hawkesbury River, Sydney**

উর্মি চক্রবর্তী – ইকোনমিক্সের মাস্টার্স করার ঝকমারি সামলে পুরো দস্তুর নানা কাজে যুক্ত। সাথে রয়েছে শায়েরীর খাতা ও ক্যামেরা। বাতায়ন ও অন্যান্য অনলাইন ম্যাগাজিনে লেখালেখি অনেক দিনের। রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুল গীতি'তে ডিপ্লোমা করা। তার লেখা লিরিক্সে গান করেছেন কলকাতার নামী শিল্পী'রা। বর্তমানে পাকাপাকি ভাবে সিডনি নিবাসী। রান্না করতে ও খাওয়াতে ভীষণ ভালোবাসেন। দেশ বিদেশের রকমারি রান্নার একটি ব্লগ চালান পাশাপাশি।

Supratik Mukherjee **Title Page - Flowers from the Garden**

অধমের নাম **সুপ্রতীক মুখার্জী** । পার্থিব বাসিন্দা । ৯টা-৫টার চাকর । পিদিমের মত টিম্‌টিমে বুদ্ধি, তা'ও নেভে না !!

Tirthankar Banerjee **Back Cover - Bidalup False, Pembertor**

His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

১৮৩১ সাল, "এইচ-এম-এস বিগল" জাহাজ প্লেমাউথ বন্দর থেকে রওনা দিয়েছিল দ্বিতীয় বারের জন্য পৃথিবী ভ্রমণে। তার কিছু বছর আগে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়াতে ইয়োলো ফিভার মহামারী শেষ হয়েছে। ওই জাহাজে জগৎ বিখ্যাত তিনি ছিলেন যিনি মানবসভ্যতার বিজ্ঞান ও দর্শনের ভবিষ্যতে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা একদিনে হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দরে নোঙর ফেলে বিভিন্ন অমূল্য অভিজ্ঞতার ঝুলি ভর্তি করতে ডারউইন সাহেবের অনেক দিন লেগেছিলো, ইতিহাস তাই বলে। কোভিডোত্তর পৃথিবীর নিও-নর্মালের সাথে আমাদের পরিচয় যখন হতে শুরু করেছে তখন পাঠকের প্রিয় "কাগজের নৌকা" তার বিংশতম সংখ্যায় প্রিয় লেখকদের লেখা নিয়ে নোঙর বাঁধতে এসেছে আমাদের মনের বন্দরে, পাঠকের অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ করতে।

সমাপ্ত হলো সুলেখিকা রমা জোয়ারদারের "চা-ঘর", যে উপন্যাসের ঘাত প্রতিঘাত পাঠককে নিবিষ্ট করে রেখেছিল এতদিন ধরে।

শুরু হলো সাহিত্যিক ছন্দসী বন্দোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস "ছায়া সীমানা"। লেখিকা দীর্ঘ দিনের অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী হলেও তার লেখায় আজও দেশের গন্ধ, মাটির গন্ধ লেগে আছে। সঙ্গে রয়েছে পরিচিত প্রিয় লেখক ও লেখিকাদের ধারাবাহিক। নৌকার ঝুলি বরাবরের মত এবারও ভর্তি করে এসে পৌঁছেছে পাঠকের মননশীলতার বিস্তীর্ণ পরিসরে। আশা রাখবো কাগজের নৌকার বিংশতম সংখ্যা পাঠকের কাছে বরাবরের মতো আবারও সমাদৃত হবে।

সুসাহিত্যিক শ্যামলী আচার্যের উপন্যাস "সুখপাখি" মুদ্রিত হয়েছে বিগত বইমেলায়। আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো পাঠক মহলে সুখপাখির জনপ্রিয়তার জন্য ও লেখিকার জন্য।

সঞ্জয় চক্রবর্তী
সিডনি

বাতায়ন ধারাবাহিক কাগজের নৌকোয় প্রকাশিত হতে চলেছে ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস "ছায়া সীমানা"। রমা জোয়ারদার-এর "চা ঘর" এবং সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চল নিধুবনে" পড়ে ভাললাগার কথা জানাচ্ছেন পাঠকেরা। শ্যামলী আচার্যের "সুখপাখি" সম্প্রতি বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসের সঙ্গে অনেকে এক ধরণের একাত্মতা বোধ করেন। কাগজের নৌকোয় প্রকাশিত ধারাবাহিক উপন্যাসের পাঠকপ্রিয়তায় আমরা আনন্দিত।

"ছায়া সীমানা" একটি ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। নবকুমার বসুর "হটাবাহার" (কাগজের নৌকোয় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাস) -এর মতো ছন্দসীদির উপন্যাসে ঘুরেফিরে এসেছে অভিবাসী জীবন ও অভিবাসী বাঙালীর সুখ, দুঃখ, আশা, বেদনা ও আনন্দ। লেখিকা নিজে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরের বাসিন্দা। তাই তাঁর রচনায় ডায়াস্পোরিক বাঙালী জীবনের যে চিত্র প্রতিফলিত হয় তা সৎ ও সজীব।

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের জগতে একটি সুপরিচিত নাম। শৈশব থেকেই তিনি সাহিত্যের অনুরাগী। সাহিত্যসৃষ্টির শখও তাঁর ছোটবেলা থেকেই। "দেশ", "সানন্দা", "আনন্দবাজার পত্রিকা", "নবকল্লোল" ও "বর্তমান পত্রিকায়" তাঁর ছোট গল্প, উপন্যাস ও ভ্রমণ নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা ও ভারত থেকে প্রকাশিত একাধিক আন্তর্জাতিক ওয়েবজিনে পাঠকেরা পেয়েছে তাঁর লেখা।

"বাতায়ন" পত্রিকার পক্ষ থেকে লেখিকাকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তাঁর উপন্যাসটি আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। শুরু হতে চলেছে ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন ধারাবাহিক "ছায়া সীমানা" কাগজের নৌকোর পরবর্তী সংখ্যাটিতে চোখ রাখুন।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক , বাতায়ন পত্রিকা গোষ্ঠী

সূচীপত্র

ধারাবাহিক

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়	**ছায়া সীমানা**	6
রমা জোয়ারদার	**চা-ঘর**	16
সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়	**চল নিধুবনে**	21
সৌমিত্র চক্রবর্তী	**সময়**	35
শকুন্তলা চৌধুরী	**পরবাসী**	46

কবিতা

তপনজ্যোতি মিত্র	**অবারিত সৌন্দর্যের দরোজা**	33
পারিজাত ব্যানার্জী	**গাঁ ঘরের প্রান্তজন কথা**	34

গল্প

সত্যজিৎ অধিকারী	**বিহান**	59
মনীষা রায়	**বিবাহ তখন-এখন**	64
শাশ্বতী বসু	**জেরাডেল-১৯**	71

স্মৃতিচারণ

প্রশান্ত চ্যাটার্জী	**একাদশতম পর্ব: বিয়ে-উধমপুর-পিতৃবিয়োগ-নগরোটা-ডিসচার্জ**	75

ধারাবাহিক উপন্যাস

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়া সীমানা

পর্ব ১

(১)

আজ, জ্যেষ্ঠ মাসের নিদাঘ-তপ্ত গোধূলি লগনে শ্রীতমার বিয়ে। সকাল থেকে উৎসবের কোলাহল আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। শ্রীতমাদের ছোট্ট বাড়িখানা আত্মীয়-বন্ধুদের কলরবে মুখর। শ্রীতমার বাবার মৃত্যুর অনেক বছর পর আজ, এবাড়ির ম্লান বিষণ্ণতা যেন সবার অলক্ষে সরে দাঁড়িয়ে প্রশস্ত করে দিয়েছে আনন্দের যাতায়াত পথ। হাসি, আমোদ, আহ্লাদের স্পর্শে পরিপূর্ণ আনন্দের বাতাস শ্রীতমাকে আপ্লুত করে তুলছে। সে ভাবছে, এত বছর ধরে যে মানুষটির জন্য অপেক্ষা করছিল, একটু পরেই সে সুমুখে এসে দাঁড়াবে। দুটি মানুষের সামনে পড়ে থাকা প্রশস্ত পথে সুখ-দুঃখ-আনন্দের জোয়ার ভাটা অতিক্রম করতে করতে, আজীবন হাত ধরাধরি ক'রে জীবনপথে হেঁটে চলার শপথ নেবে। শ্রীতমার স্বামী হবে তার গুরু, অন্তরঙ্গ, সহচর এবং চিরসখা। এই সুখ চিন্তাটা বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে গভীর ভালবাসার শিহরণ তুলল শ্রীতমার দেহ-মনে। শ্রীতমার জীবনে তার স্বামীই একমাত্র পুরুষ। এই পুরুষটির অপেক্ষায়, এত বছর ধরে নিজেকে নিষ্পাপ, অনাঘ্রাত রেখেছে সে।

শ্রীতমা আরও ভাবছে। হবু স্বামীকে এযাবৎ মাত্র তিনবার দেখেছে সে। প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল তার মামার বাড়িতে। তবে সেই দেখাটা পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের উদ্দেশ্য নিয়ে হয় নি আদৌ। ঘটনাটা ছিল সম্পূর্ণ কাকতালীয়। চোখ বন্ধ করলে এখনো স্পষ্ট দেখতে পায় শ্রীতমা।

ভাইফোঁটার দিন। মায়ের সঙ্গে খুব সকালে মামাবাড়ি চলে গিয়েছিল শ্রীতমা। মামা-মামীর দুই যমজ ছেলে চয়ন আর চন্দন, নিজেদের একটি বোনের অভাবে, শ্রীতমাদিকেই তাদের চোখের মণি করে নিয়েছে। ওকে দেখে ধেয়ে এসে পরামানন্দে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। চন্দন বলেছিল, "আরে ইত্নী জলিদ এসে গেছিস! বহুত খুব। ফাস্ট ক্লাস"।

– কেন রে ? বহুত খুব – "ফাস্ট ক্লাসের কি দেখলি তোরা"? হাসিমুখে শ্রীতমার মা গৌরী শুধিয়েছিলেন।

– আরে রাঙ্গা পিসিমা, "তুমি জানোই না আজ ভাই ফোঁটায় কি দারুণ দারুণ খানা তৈয়ার হচ্ছে", চয়ন বলল, "একদম মুগলাই খানা"।

– "আর বঙ্গালি ভি", উত্তেজনায় টগ্‌বগ্‌ করতে করতে চন্দন যোগ দিল, "হিল্‌সা মছ্‌লী কা পাতুরি, পরোয়ালের দোর্মা, আলু দম, টমাটর কা চট্‌নী, বংলা মিঠাই – ঔর কিত্‌না কুছ্‌। আপ জরা চৌকে মে ঝাঁক কর দেখো ভি। উঁকি মেরে দেখো রান্নাঘরে"।

চয়ন আর চন্দনের পেছনে কখন এসে মামীমা দাঁড়িয়েছিলেন, টেরই পায় নি কেউ। তিনি ছেলেদের বলেছিলেন, "আচ্ছা অনেক হয়েছে। তুম লোগ অব্‌ ফুটো হিঁয়া সে"।

তারপর গৌরী আর শ্রীতমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভেতর বারান্দায়, রান্নাঘরের কাছ ঘেঁসে মোড়া পেতে বসিয়ে ছিলেন। রান্নাঘরে তখন গুটি তিনেক কাজের লোক আসন্ন মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজনে ছুটোছুটি করছে। অন্তঃপুরে, চৌকো বারান্দাটার একটা দিকে সারি সারি ঘর আর অপরদিকটি ঘিরে মস্ত উঠোন। সেই উঠোনের একপ্রান্তে দুটো বিশাল উনুন জ্বালিয়ে ভিয়েন বসেছে। গৌরী আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, "ব্যাপার কি, বৌদি? এ যে যজ্ঞিবাড়ির আয়োজন! হঠাৎ এত বাড়াবাড়ি"?

গৌরীর বৌদি প্রভা একটু যেন ক্ষুণ্ন হয়ে বলেছিলেন, "ও মা! বাড়াবাড়ির কি দেখলে, ঠাকুরঝি? প্রতি বছরেই তো ভাই ফোঁটার দিনটিতে এমনি ঘটাপটা হয় এ বাড়িতে! হয় না"?

অপ্রস্তুত হয়ে গৌরী বলেছিলেন, "না গো বৌদি, আমি সেরকম ভাবে কিছু বলছি না। মানে ভাবছিলাম, আজ কি তোমাদের বাড়িতে কোন বিশেষ অতিথি আসবেন? তোমার বাপের বাড়ির কেউ"?

তেমনি হাসি হাসি মুখে, প্রসন্নমুখে প্রভা বলেছিলেন, "বিশেষ অতিথি! তা অবশ্য বলতে পারো। আমার বাপের বাড়ির কেউ না, তবে তোমার দাদার এক পুরনো বন্ধু নরেন্দ্রনাথ মুখুজ্জে। তাঁরা সপরিবার এসেছেন কোলকাতা থেকে। ওঁর ছেলের বাড়িতে উঠেছেন। তোমার দাদা তো তাঁদেরই আনতে গিয়েছেন"।

এরপর গৌরী ভাইফোঁটার তদারকিতে লেগে পড়েছিলেন। বারান্দার এক প্রান্তে সারি সারি আসন পাতা হয়েছিল শ্রীতমার মামা আর চয়ন-চন্দনের জন্য। তাঁর স্বহস্তে প্রস্তুত পায়েস এবং রকমারি মিষ্টি থালায় থালায় সাজিয়ে রেখেছিলেন গৌরী। শ্রীতমা চন্দন ঘষে তুলে রেখেছিল ছোট্ট রূপোর বাটিতে। রূপোর রেকাবিতে ফুল, ধান আর দূর্বা সাজিয়ে দিয়েছিল। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলেছিল।

আর একটু পরেই বন্ধু, বন্ধুর স্ত্রী এবং তাঁদের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হুড়মুড় করে চলে এসেছিলেন শ্রীতমার মামা নিশিথ চাটুজ্জে। ভাইফোঁটা পর্ব চুকে গেলে নিশিথ, একে একে পরিবারের সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অতিথিদের।

শ্রীতমা জেনেছিল তার মামার বন্ধুপুত্রটির নাম সঞ্জয় মুখার্জী। দীর্ঘ নয় বছর অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সে পি এই ডি শেষ করে, কয়েক মাস হল সে ভারতে ফিরেছে। আপাততঃ সে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পূটার বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনায় লিপ্ত। ভাইফোঁটা বিপুল সমারোহের সেই দিনটিতে একটিমাত্র অল্পবয়সী মেয়ে বলেই শ্রীতমা সবার মাঝে মধ্যমণি হয়েছিল। বড়মামার বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীর প্রভূত কৌতূহলী প্রশ্নের সম্মুখীনও হতে হয়েছিল তাকে।

সন্ধ্যেবেলা মায়ের সঙ্গে সে বাড়ি ফিরেছিল মনে খানিক বিরক্তি নিয়ে। কিন্তু গৌরীর ভারি ভাল লেগেছিল নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী শান্তিময়ীকে। সঞ্জয়কে দেখেও তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। অতএব, দাদার বাড়ি থেকে ফিরে এসে তিনি ওঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ছিলেন পাক্কা দু-দুটো দিন।

কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের কর্ম ব্যস্ততায় স্বল্প-পরিচিত মুখার্জীদের কথা বিস্মৃত হতে বিশেষ দেরী হয় নি গৌরীর। অন্য দিকে শ্রীতমা বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে মনোবিজ্ঞানের অনার্স ছাত্রী। লেখালেখির ভূতও আনাগোনা করে তার মাথায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ডিবেটিং ক্লাবগুলোর মধ্যেও সক্রিয় সে। তাই ভাইফোঁটা দিনটির কথা ভুলে যেতে তারও বেশী দেরি লাগে নি।

কিন্তু, মাসখানেক পর, আবার দেখা হয়ে গিয়েছিল সঞ্জয়ের সঙ্গে, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে।

দু'দিনের জন্য, শ্রীতমা তার দুই বন্ধু বিজয়া আর পবিত্রর সঙ্গে গিয়েছিল সারনাথ। বজ্র বিদ্যা ইন্সিটট্যুটে আয়োজিত একটা সেমিনারে যোগ দিতে। সেমিনারের বিষয় ছিল, "ল্যাম্প্ দ্যাট্ ডিস্পেল্স্ ডার্কনেস"।

সেখানেই, কাশী ফিরে আসার দিনটিতে, গেস্ট হাউস থেকে লাঞ্চ খেয়ে ওরা সবে বেরিয়েছে। বিজয়ার প্রস্তাবে ওরা "মৃগদাও"এর দিকে অগ্রসর হয়েছিল।

খানিক এগিয়ে থম্কে দাঁড়িয়ে পড়ে বিজয়া ফিস্ফিস্ করে বন্ধুদের বলেছিল, "ওই দ্যাখ্ দ্যাখ্ লোকটাকে – এইমাত্র

যেন লন্ডন থেকে এসে নেমেছে"। পবিত্র আর শ্রীতমার সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখে বিজয়া আবার বলেছিল, "ওই যে রে, স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। চোখে ট্রেন্ডি সান্ গ্লাস্। আরেব্বাস! কি ঠাঁট"!

এবার ওরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মানুষটির দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে জোর হোঁচট খেয়েছিল শ্রীতমা। "আরে, লোকটা মামার সেই বন্ধুর ছেলে না !" ওর মন বলে উঠেছিল, "ভাইফোঁটার দিন এর সঙ্গেই তো আলাপ হয়েছিল ! সঞ্জয় মুখার্জী"!

অতঃপর ওরা তিনজন পায়ে পায়ে এগিয়ে ধর্ম রাজিকা স্তূপের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মগ্ন হয়ে তখন ছবি তুলছিল বিজয়ার আখ্যা দেওয়া সেই "সাহেব" ছেলেটা। হঠাৎ অতগুলো পদসঞ্চালনার আওয়াজ ওর পাশে এসে থামতে মগ্নতা ভগ্ন হয়েছিল। ছেলেটার দৃষ্টি একে একে ওদের মুখের ওপর ঘুরতে ঘুরতে শ্রীতমার মুখের ওপর আট্‌কে গিয়েছিল। ক্যামেরা হাতে নিয়ে সে শ্রীতমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "আপনি শ্রীতমা ব্যানার্জী না? ভাইফোঁটার দিন দেখা হয়েছিল নিশিথ কাকার বাড়িতে"?

– হ্যাঁ, আমি শ্রীতমা। আপনি এখানে "অমায়িক হেসে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়েছিল শ্রীতমা"।

– হঠাৎ চলে এলাম। "ছবি তোলার জন্য জায়গাটা মন্দ নয়"।

বন্ধুদের সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিয়েছিল শ্রীতমা, "এ আমার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিজয়া মিত্র। আর ও কবি পবিত্র রায়। গিটার বাজিয়ে গানও গায় আবার"। ওরা হাসিমুখে নমস্কার করেছিল সঞ্জয়কে।

– আর ইনি, এবার সঞ্জয়ের পরিচয় দিয়ে বন্ধুদের সে বলেছিল, "ইনি সঞ্জয় মুখার্জী। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। ছাত্র জীবনে অনেকগুলো বছর অস্ট্রেলিয়ায় কাটিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। এখন আপাততঃ বি এইচ উই-তে পড়াচ্ছেন"।

– নাইস টু মীট ইউ অল্, হাসিমুখে সঞ্জয় বলেছিল, "তা এখানে কি পিক্‌নিক্ করতে এসেছেন আপনারা"?

– "না", সঞ্জয়ের একটু কাছে সরে এসে বলেছিল বিজয়া, "আমরা এখানে এসেছিলাম একটা উইকএন্ড সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে। বৌদ্ধ দর্শন এবং বৌদ্ধ মেডিটেশনের টেকনিকের ওপর সেমিনার। একটু পরেই আমরা বেনারস ফিরে যাব"।

– "ও!", সঞ্জয়ের চোখে মুখে কৌতূকের হাসি খেলে গিয়েছিল। বলেছিল, "আপনারা সকলে বুঝি বুডিস্ট ? মানে – বৌদ্ধ"?

– "না রে বাবা, না", ঘাড় নেড়ে প্রবল প্রতিবাদ করেছিল বিজয়া, "আমরা কেউ বৌদ্ধ নই। অ্যাক্‌চুয়ালি সত্যি কথা বলতে কি আমরা হিন্দুও নই। তবে আমরা তিনজনেই মনের মধ্যে ঈশ্বর বা সুপার পাওয়ারকে নিয়ে একটা কন্‌সেপ্ট বহন করি আর সেই কন্‌সেপ্টের সঙ্গে বুডিস্ট দর্শনের একটা যোগসূত্র খুঁজে পাবার আশায় এই সেমিনারে আসা"।

– "বাস রে ! কি গুরুগম্ভীর কথাবার্তা," দুই চোখ বিস্ফারিত করেছিল সঞ্জয়, "আপনারা ফিলসফির স্টুডেন্ট নাকি ? অদৃশ্য প্রদীপ নিয়ে সত্যের সন্ধানে ঘুরছেন"?

– "নাঃ!" আবার বিজয়া উত্তর দিয়েছিল, "শ্রী সাইকোলজিতে এবছর অনার্স পরীক্ষা দেবে। পবিত্র'র এবার ইকনমিক্‌সে অনার্স। হ্যাঁ, আমি অবশ্য ফিলসফিতে অনার্স করছি। আমারও এটা ফাইনাল ইয়ার"।

– বাঃ! আপনারা তো হেভি ওয়েট পড়াশোনায় লিপ্ত। ভাল, খুব ভাল।

– "ঠিক আছে", শ্রীতমা হঠাৎ বলেছিল, "আমরা আসি এবার। আপনিও ছবি তোলায় ফিরে যান"।

আলোচনার সব পথ আচম্‌কা বন্ধ করে বিজয়াকে প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে সে সারণাথ ম্যুজিয়ম অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিল।

পবিত্রও ওদের পিছু নিয়েছিল গুটিগুটি।

একটু এগিয়ে গিয়ে বিজয়া পরম বিরক্তিতে শ্রীতমার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, "এটা কি হল ? আমরা অমন হৈ হৈ কর ওখান থেকে পালিয়ে এলাম কেন, শুনি ? সঞ্জয়ের সঙ্গে আর একটু আলাপ করলে তোর প্রবলেমটা কোথায় ছিল বল্ তো, শ্রী"?

– "বাঃ! আমাদের ম্যুজিয়ম দেখে বাড়ি ফিরতে হবে না ? তাড়াতাড়ি না করলে বাস ছেড়ে দেবে যে", কৈফিয়তের সুরে বলেছিল অপ্রস্তুত শ্রীতমা।

– "অমন সাহেবী চেহারা মানুষটার। আর কি দারুণ স্মার্ট। কথাবার্তার স্টাইলও লাজবাব", বিজয়ার কথাগুলো থেকে যেন আক্ষেপ চুঁইয়ে পড়েছিল, "আর একটুক্ষণ আলাপ করলে কি যে ক্ষতি হত! না হয় ম্যুজিয়মটা আর একদিন এসে দেখে যেতাম।"

– এত দূর ! তোর হলটা কি বিজয়া ? প্রেমে পড়ে গেলি নাকি ?

হঠাৎ একটা খিক্‌খিক্ হাসি শুনে ওরা দুজনেই চম্‌কে পিছন ফিরে তাকিয়েছিল।

এক সঙ্গে দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল নাচিয়ে পবিত্র হাসছিল। বলেছিল, "বিজয়া ম্যাম্, তুই যতই প্রেমে পড়িস না কেন, কোন লাভ হবে না"।

– "মানে", ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিল বিজয়া।

– "মানে এই যে ওই সাহেবী চেহারার ছেলেটা, সে তো শ্রীতমা ম্যামের জন্য। তোর জন্য নয়। ওদিকে মোটে হাত বাড়াতে যাস না। দুঃখ পাবি"।

শ্রীতমা আর বিজয়া গভীর বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়েছিল নির্বাক। পবিত্র বলেছিল, "এই বন্ধুটার পরামর্শ মনে রাখিস, কেমন"?

স্তম্ভিত ওরা চুপচাপ হাঁটতে আরম্ভ করতেই পবিত্র আবার হঠাৎ বলে উঠেছিল, "কিন্তু শ্রী, তুই যদি এই সঞ্জয় ছেলেটার গলায় মালা দিস তাইলে রাজীব কা ক্যা হোগা রে "?

– "এবার থাম্‌বি তুই পবিত্র ?", ক্রুদ্ধ স্বরে বলেছিল শ্রীতমা, "বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে"।

– বাড়াবাড়ি! ঠিক আছে আর করব না বাড়াবাড়ি। চুপ করে থাকব", পবিত্র বলেছিল।

(২)

বাড়ি ফিরে এসে অবশ্যই সারনাথে শেষ দিনটার কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পায় নি শ্রীতমা। ইউনিভার্সিটির ডিবেটিং ফ্যাকাল্টির ডিবেটগুলোর আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল ওদের ফেরার পর পরই। সাইকোলজির ফ্যাকাল্টির তরফ থেকে নির্বাচিত হয়ে শ্রীতমা তৈরি হচ্ছিল হ্যুম্যানিটিজ ফ্যাকাল্টির রাজীব শর্মার বিপরীতে।

রাজীব শর্মা ইংলিশ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। অসাধারণ মেধাবী এবং বাগ্মী। এছাড়াও সে অল্‌রাউন্ডার। বিজয়ার ভাষায় রাজীব নাকি "সর্ব ঘটে কাঁঠালি কলা"।

ইউনিভার্সিটির অতি জনপ্রিয় পত্রিকা "গুঞ্জন"এর অন্যতম সম্পাদক সে। শ্রীতমা মাঝে মাঝে সেই পত্রিকায় সমালোচনা, রিভিউ এবং প্রবন্ধ লিখে পাঠায় এবং সেই সূত্রেই রাজীবের সঙ্গে ওর কয়েকবার দেখা এবং কথাবার্তা হয়েছে। অতি সংক্ষিপ্ত সেই সব সাক্ষাৎ আর কথোপকথন।

অথচ ডিবেটের দিন, জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং পুরুষালি চেহারার অধিকারী, ছয় ফুট দুই ইঞ্চি দীর্ঘ রাজীব সান্যাল যখন ওর মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসেছিল, শ্রীতমার বুকের ভেতরে ছোট্ট হৃৎপিন্ডটা হঠাৎ গতি বাড়িয়ে, আতঙ্কে লাফিয়ে উঠেছিল।

তর্কের বিষয় বস্তু ছিল – পথ বনাম পরিণতি।

রাজীব ছিল "সব ভাল যার শেষ ভাল"র পক্ষে। সে বলেছিল, দ্য এন্ড জস্টিফাইস দ্য মীন্‌স্। আসল কথাটা হল পরিণতি অথবা লক্ষ্য। জীবনে সফল হতে গেলে আশাময় পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই শেষ কথা। এবং একবার সেই সুখদ পরিণতিতে পৌঁছে গেলে, কিভাবে সেখানে পৌঁছানো গেল সে সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করাটা অপ্রাসঙ্গিক। এমন কি, ফলপ্রসূ যে কোন পরিণতিতে পৌঁছানোর জন্য অসৎ পথ বেছে নিতেও বাধা থাকা উচিত নয়।

রাজীব আরও বলেছিল, কর্মে লিপ্ত হবার আগে মানুষকে পরিণতির কথা অবশ্যই ভাবতে হবে, কিন্তু ওই সঙ্গেই বিবেচনা করা প্রয়োজন যে তার বেছে নেওয়া অপ্রিয় বা কষ্টদায়ক কর্ম শেষমেস তাকে এক সম্ভাবনাময় পরিণতির দিকেই নিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীতমা ছিল সৎ পথে হাঁটার পক্ষে। ওর বক্তব্য ছিল যে একজন সৎ মানুষ দারিদ্রের মাঝে বেঁচে থেকেও জীবনে সুখী হতে সক্ষম কারণ সততাই তার সব চেয়ে জোরালো হাতিয়ার। সমাজ-অনুমোদিত পথে হেঁটে সে আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। এবং সেই প্রত্যয়ের জোরে জীবন পথে এগিয়ে যায় অবশ্যম্ভাবী সুপরিণতির প্রত্যাশায়।

এবং সৎ পথে চলার নৈতিকতাই স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

বিচারকেরা রাজীবকেই বিজয়ী ঘোষণা করেছিলেন। করাটাই অবশ্য স্বাভাবিক ছিল। শ্রীতমা নিজেই রাজীবের বলার ভঙ্গী, পরিষ্কার উচ্চারণ, নাটকীয় ডেলিভরি স্টাইল এবং অকাট্য যুক্তির জোর দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিচারকদের আর দোষ কি!

এই জয়লাভের পর রাজীব ইন্টার-ইনস্টিটিউট ডিবেটে যোগ দেবে।

ক্ষুণ্ন মনে ডিবেটিং হল থেকে বেরিয়ে মন্থরগতিতে ক্যান্টিনের দিকে অগ্রসর হয়েছিল শ্রীতমা। পরাজয়ের এই মুহূর্তে এক কাপ গরম কফি ওকে অবসাদ-মুক্ত করতে পারে।

– "আজ আপনার বডিগার্ডেরা কোথায়"? প্রশ্নটা শুনে চমকিত হয়ে শ্রীতমা দেখেছিল রাজীব ওর পাশাপাশি হাঁটছে!

– আমার বডিগার্ড!

– "নয়? বিজয়া আর পবিত্র"? সুন্দর হেসে বলেছিল রাজীব, "আপনাকে যখনি দেখি ওরা সঙ্গে থাকে"!

– ওরা এখন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। পরীক্ষা তো প্রায় দরজায়।

– ঠিক।

দু মিনিট নীরব রাজীব। শ্রীতমার সঙ্গেই হাঁটছে। হঠাৎ বলল, "আপনি কি আজকের ডিবেটিং আউটকামে দুঃখ পেয়েছেন"?

– নাঃ! আপনার কাছে যে হেরে যাব, সে তো জানা কথাই ছিল। আর হার-জিত নিয়েই তো আমাদের জীবন। অনুক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছি হার-জিতের লড়াই।

– সেই জন্যই হার-জিতের খেলায় কোনটাকেই সীরিয়াসলি নিতে নেই। দীজ থিংস ডোন্ট ম্যাটার। আজ আমি জিতলাম, কিন্তু কাল আপনিই জিতবেন।

– আমি এখন ক্যান্টিনে যাচ্ছি কফির প্রত্যাশায়।

– "ও", রাজীব আবার হেসেছিল, "চলুন। আমিও যাব। এক কাপ কফি মন্দ হবে না। নার্ভগুলো হয়তো একটু ঠান্ডা হবে। আপনার আপত্তি আছে"?

– অবশ্যই না। আপনি কফি খাবেন, তাতে আমার কি বলার থাকতে পারে।

ওরা দুজনে ক্যান্টিনে ঢুকে একটা জানালার পাশ ঘেঁষে বসেছিল মুখোমুখি। মিনিট দশেকের মধ্যে গোটা বারো মেয়ে ওদের টেবিলে এসে রাজীবকে "হ্যালো হ্যান্ডসাম", "হ্যালো মিস্টার জিনিয়স", "হায় দেয়ার টেনিস স্টার" ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করে গিয়েছিল, শ্রীতমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।

কফি এসে গিয়েছিল ততক্ষণে।

– "আপনি যে এমন লেডিস ম্যান, জানতাম না তো", শ্রীতমা বলেছিল।

ওর মন্তব্যটা যেন রাজীবের কানেই যায় নি। বলেছিল, "সত্যি-সত্যিই কি আপনি বিশ্বাস করেন যে মীন্‌স্ জাস্টিফাইস দ্য এন্ড ? যে কোন পরিস্থিতিতেই আগে কর্মের সততা যাচাই করে নিয়ে তবেই পরিণতির দিকে এগুনো উচিত ? ডু ইউ রিয়ালি মীন ইট"?

– "হ্যাঁ, আমি তাই বিশ্বাস করি", নিশ্চিন্ত সুরে বলেছিল শ্রীতমা, "কারণ যে কোন সৎ উপায় যখন মানুষকে একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তখন সে নৈতিক মূল্যবোধের দ্বারা চালিত হয়, সম্ভাব্য পরিণতির আকাঙ্খা দিয়ে নয়। কর্মকর্তা সে ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় সংক্রান্ত, নীতি পরায়ণ কথা চিন্তা করেই পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়"।

– "হুম্। ইন্টারেস্টিং", কফির পেয়ালার চুমুক দিয়ে রাজীব বলেছিল।

– আমার তো তাই মনে হয়। আপনি একটা ডেঞ্জারাস ক্যাম্পের সমর্থন করছেন। বলছেন, End justifies the means। অর্থাৎ ছলে-বলে-কৌশলে নিজের গন্তব্য পথে এগিয়ে যাও। যেন তেন প্রকারেণ নিজের কাজ হাসিল করো – মার্চ টুওয়ার্ড্‌স্ আ প্রমিসিং এন্ড উইদাউট এনি থট অ্যাবাউট দ্য মীন্‌স্ ইউ হ্যাভ অ্যাডপ্‌টেড"।

রাজীব মন দিয়ে শুনছিল ওর প্রত্যেকটি কথা। শ্রীতমা আবার বলেছিল, "দেখুন আমাদের সমাজে এখনো নৈতিক সততার মূল্য আছে। সবাই যদি আপনার কথা মেনে চলে তাহলে আমাদের সমাজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, বুঝতে পারছেন"?

– "ইয়েস্ ইন্‌ডীড! এবং এন্‌ড্ বনাম মীন্‌স্-এর ডিবেট সব সময়েই মানুষকে কোন না কোন মরাল পরিস্থিতির সম্মুখীন করবে। এই নিয়ে ডিবেট না হয় আর একদিনের জন্য মুলতুবি থাক, কি বলেন?" রাজীব স্নিগ্ধ হেসেছিল।

– থাক্ তবে। চলুন এবার ওঠা যাক।

– চলুন।

ওরা দুজনে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে এসেছিল অতঃপর। রাজীব চট্ করে হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, "আমায় এবার বাড়ি ছুট্তে হবে। একটা ফাংশন আছে।" তারপর, দ্রুতপদে একটু এগিয়ে কি যেন মনে পড়তে শ্রীতমার কাছে আবার ফিরে এসে বলেছিল, "ওই যাঃ! আসল কথাটাই তো বলা হয় নি। আপনার ডিবেটের ডেলিভারিটা খুব চমৎকার হয়েছিল। ভেরি ইম্প্রেসিভ"।

– "ধন্যবাদ", শ্রীতমা বলেছিল।

★ ★ ★ ★ ★

বেটের কয়েকদিন পর সঞ্জয়ের সঙ্গে শ্রীতমার তৃতীয় সাক্ষাৎকারটা ঘটেছিল।

ফেব্রুয়ারি মাসটা কাশীতে ভারি মনোরম। শীত তখন পাত্তাড়ি গুটিয়ে চলে যাবার উপক্রম করছে। শীতের রেশ কাটিয়ে উষ্ণতার স্পর্শে বসন্তের বাতাস তখন ভারি। ফুলের সৌরভে মশগুল। নবমঞ্জরীর ভারে ঝুঁকে পড়া আমগাছের ডালগুলো থেকে অনুক্ষণ ডাকতে থাকে কোকিল ছানারা।

বসন্তের এরকমই এক সকালে উঠে পড়াশোনা নিয়ে বসেছিল শ্রীতমা। আর বাতাসে ভেসে আসা আম্র মঞ্জরীর সুবাস এবং কোকিল ছানাদের ঐক্যতান শুনতে শুনতে আচম্কা ওর মনে এসেছিল ভাবনাটা। কবিরা যতই বসন্তের স্তব করুন না কেন, প্রেমিক-প্রেমিকারা যতই ভালবাসার উন্মাদনায় মেতে উঠুক না কেন এবং স্বয়ং মদনদেবও বসন্তের আগমনে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর তীর ধনুক নিয়ে প্রেম-ভালবাসার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ুন না কেন, আসলে ছাত্র সম্প্রদায়ের জন্য বসন্তের আগমন মানে বেজায় আতঙ্ক।

আসন্ন পরীক্ষার আতঙ্ক। নবপ্রজন্মের সদ্য ডিম ফুটে বেরিয়ে আশা মশাদের সমবেত গুঞ্জন এবং আক্রমণের আতঙ্ক। এবং রাত জেগে বার্ষিক পরীক্ষা-প্রস্তুতির ভয়ানক বিরক্তিকর আতঙ্ক।

ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই হেসে ফেলেছিল শ্রীতমা। পরীক্ষা তারও দোরগোড়ায় এসে পড়েছে।

সেদিন গৌরী সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়েছিলেন তাঁর দাদার বাড়ি। বৌদির জরুরি তলবে।

শ্রীতমা তার বইপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিল খাবার টেবিলের ওপর। পরীক্ষা আরম্ভ হবে সাইকোপ্যাথলজির পেপার দিয়ে তাই সেদিন সাইকোপ্যাথলজি রিভিসন আরম্ভ করার কথা।

সদরে হঠাৎ ডোর বেলের আওয়াজ। কারো তো আসার কথা নয় ! ছুটে গিয়ে দরজা খুলে আগন্তুককে দেখে যেন আকাশ থেকে পড়েছিল সে। অস্ফুটে বলেছিল, "আপনি ? কি আশ্চর্য"!

– চলে এলাম – আজ ছুটির দিন সকালে কিছু করার ছিল না। ভাবলাম, আপনার আর মাসীমার সঙ্গে একটু গল্প করে আসি।

শ্রীতমা স্থাণু হয়ে তখনো দাঁড়িয়ে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

– "মে আই কাম ইন"? সঞ্জয় জিজ্ঞেস করেছিল।

– "নিশ্চয়ই। ডু কাম ইন," চমক ভেঙ্গে অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল শ্রীতমা।

বসার ঘরে সোফায় বসে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছিল সঞ্জয়। ঘরের আসবাবপত্র সাধারণ কিন্তু ছিমছাম, পরিষ্কার।

– "মাসীমা কোথায়"? সঞ্জয় জিগ্যেস করেছিল।

– মা আজ আমার মামার বাড়ি গিয়েছেন। সারাদিনের প্রোগ্রাম। সন্ধ্যেবেলা ফিরবে।

– ও। আপনি যান নি কেন ?

– আমার ফাইনাল পরীক্ষা একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। এখন লেখাপড়া না করলেই নয়।

– "ঠিকই তো। এই পরীক্ষা ব্যাপারটা সত্যিই যা-তা," সঞ্জয় গম্ভীর হয়ে বলল, "তাহলে আমি এসে তো আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম"।

শ্রীতমা হেসে ফেলে বলেছিল, "এসেই যখন পড়েছেন তখন আর কি করা ! কফি খাবেন"?

– আইডিয়াটা মন্দ নয়। কিন্তু আপনার পড়াশোনা ?

– ঘন্টাখানেক পরে করব না হয়।

– অর্থাৎ আমরা ঘন্টাখানেক আড্ডা দিতেই পারি ? কি বলেন ?

– পারেন। কিন্তু এক ঘন্টার বেশী না।

কফি আর বিস্কুট নিয়ে ওরা ছোট্ট ডাইনিং স্পেসে এসে চেয়ার টেনে বসেছিল। চারজনের মত খাবার টেবিলটার ওপর ছত্রাখান বইখাতা দেখে সঞ্জয় বলেছিল, "আপনি খাবার টেবিলের ওপর এমন জাঁকিয়ে যে বইয়ের সংসার পেতে বসে আছেন, মাসীমা বিরক্ত হন না"?

– "নাঃ ! বিরক্ত হবেন কেন"? শ্রীতমা দুষ্টু হেসে বলেছিল, "গত কুড়িটা বছর ধরে আমাকে নিয়ে ঘর করে তিনি এখন আমার সহ-অবস্থিতিতে ওয়ান হান্ড্রেড পর্সেন্ট অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমার কোন কাজই আর ওঁকে বিরক্ত বা বিস্মিত করে না"।

ধীরে-সুস্থে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সঞ্জয় একটা বই তুলে নিয়ে বলল, "সাইকোপ্যাথলজি"?

– হ্যাঁ। সাইকোপ্যাথলজি। আমার পরীক্ষার আরম্ভ হবে এই বিষয়টা দিয়ে। সাইকোপ্যাথলজির আওতায় পড়ে মনোবিকার এবং মানসিক অসঙ্গতি। তবে –

– "তবে ?" শ্রীতমাকে থেমে যেতে দেখে সঞ্জয় প্রশ্ন করল,

– "তবে", শ্রীতমা মুচকি হেসে বলল, "আমার তো মনে হয় আমরা সকলেই – অর্থাৎ সাধারণ অ্যাভারেজ মানুষ – সাইকোপ্যাথলজির আওতাতেই পড়ি। শুধু বুঝতে পারি না"।

– বলেন কি !

– আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা বিশ্বাস করি আমরা নিজেরা "এক্কেবারে স্বাভাবিক"। এবং "অস্বাভাবিক" আমাদের চারিপাশের অন্য সকলে। অথচ স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিকের ডেফিনিশনটা যে কি – কখনো কি ভাবতে চেষ্টা করি আমরা"?

– কি ডেফিনিশন ?

– সেই তো। জানি না কখনো ভেবে দেখেছেন কি না। আসলে স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিকের মাঝের তফাৎটা অতি সূক্ষ্ম। অতি সূক্ষ্ম একটা সূতোর ওপর যেন ঝুলছে ব্যালেন্স করে। এক রত্তি, শুধুমাত্র এক রত্তি – সরে এলেই "স্বাভাবিক" মুখ থুবড়ে গিয়ে পড়বে "অস্বাভাবিকের" সীমানায়।

– "আ ভেরি স্লেন্ডার ব্যালেন্স ইনডীড", সঞ্জয় মন্তব্য করেছিল।

সহসা শ্রীতমা থেমে গিয়ে দেখেছিল, ওর দিকে নির্নিমেষ চেয়ে আছে সঞ্জয়। একটু লজ্জিত হয়ে বলেছিল, "সরি। ঝোঁকের মাথায় বড় বেশী বক্‌বক্‌ করে ফেললাম। রিয়েলি সরি"।

– সরি হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। জানেন, আপনার কথাগুলো আমার খুব থট্‌ প্রোভোকিং লাগছিল। ভাবনা-চিন্তাকে উস্‌কে দিচ্ছিল, আর কি।

– হ্যাঁ, দারুণ ফ্যাসিনেটিং এই বিষয়টা। মানুষ কখন "স্বাভাবিক", কখন "অস্বাভাবিক" – "কেনই বা স্বাভাবিকতা আর অস্বাভাবিকতার মধ্যে তার নিয়ত আনাগোনা", বলতে বলতে শ্রীতমার চোখ পড়ল সঞ্জয়ের কফি মগটার দিকে। ব্যস্ত হয়ে বলল, "আরে, দেখুন তো ! আপনার কফি যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল ! ভাল হয় নি কফিটা"?

– আসলে আপনার কথা শুনতে শুনতে কফিকে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম", সঞ্জয় হেসে বলেছিল।

– দাঁড়ান, আর এক কাপ কফি বানিয়ে আনি। বেশীক্ষণ লাগবে না।

– না, না। তার দরকার নেই। তার চেয়ে এটাকেই মাইক্রোওয়েভে গরম করে –

– "আমাদের বাড়িতে তো মাইক্রোওয়েভ নেই", শ্রীতমা মুখ কাচুমাচু করে বলেছিল।

– "নেই ? কেন"?

– মা বলে মাইক্রোওয়েভ একটা অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা। তাই –

– আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনাকে কফি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। এবার বলুন তো –

– "কি ?" সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়েছিল শ্রীতমা।

– "আপনার সেই বন্ধুরা – বিজয়া আর পবিত্র – যাঁদের সঙ্গে সারনাথে আলাপ হয়েছিল – তারা কোন্‌ গন্ডীতে পড়েন", গম্ভীর মুখে বলেছিল সঞ্জয়, "না, মানে সাইকোপ্যাথলজিস্ট হিসেবে আপনি ওঁদের কোন্‌ গ্রুপে রাখবেন"?

এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন রে বাবা ! মহা ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিল শ্রীতমা।

ওকে চিন্তিত দেখে সঞ্জয় আবার বলেছিল, "বলুন। ধরে নিন ওঁরা আপনার কেস স্টডি। আপনার পরিভাষা অ্যাপ্লাই করুন ওদের ক্ষেত্রে"।

কয়েক মিনিট ভেবেছিল শ্রীতমা। তারপর বলেছিল, "এ নিয়ে তো আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারি না"।

– কেন ?

– কন্‌ফিডেন্‌শিয়ালিটি বলে একটা ব্যাপার আছে। তা কি আপনি জানেন না ?

– "তাই তো। আমি অতখানি তলিয়ে ভাবি নি", সঞ্জয় অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল।

★ ★ ★ ★ ★

– দিদি, আরে ও হমারি প্যারী দিদি," ফোনের অন্য প্রান্তে চয়নের গলা।

আর মোটে দু' দিন পরে শ্রীতমার ফাইনাল পরীক্ষা আরম্ভ হবে। ছাত্রদের পরীক্ষা-প্রস্তুতির জন্য তখন কলেজ বন্ধ। দিনরাত্রি এক করে পড়াশোনা করছিল মেয়ে। ওকে সকালে লুচি-আলুর দম জলখাবার খাইয়ে দিয়ে, এবং দুপুরে খাবার জন্য আলু, বড়ি, বেগুন দিয়ে রুই মাছের ঝোল আর ভাত রান্না করে রেখে দিয়ে গৌরী তাঁর স্কুলে চলে গিয়েছিলেন। ফিরবেন সেই সন্ধ্যায়।

শ্রীতমা তখন গভীর অধ্যয়নরত। হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠায় ওর মগ্নতা হোঁচট খেল। উঠে গিয়ে ফোনটা তুলে নিয়ে "হ্যালো" বলতেই চয়ন কল্‌কলিয়ে উঠল, "দিদি, আরে ও হমারি প্যারী দিদি"।

– "কি হচ্ছে কি ? কেন ফোন করেছিস"? শ্রীতমা ধমক দিল।

– "তেরী তো শাদী হ্যায় রে", ও প্রান্ত থেকে চয়ন আর চন্দনের হাসি যেন আর বাঁধ মানে না।

– শাদী ! আমার ! এসব মজাক করার আর সময় পেলি না তোরা ? দাঁড়া, আমি আজই মামীমার সঙ্গে কথা বলব। খুব ফাজিল হয়েছ তোমরা।

– "বল্‌বি তো বলে নিস, কুছ্ পরোয়া নহি", হস্তান্তরিত ফোনের ওদিক থেকে এবার চন্দনের গলা শোনা গেল, "হমারে ঘর পর সব কো মালুম হ্যয়। রাঙ্গাপিসি তো উসি লিয়ে য়ঁহা আই থী না ? তেরি শাদী কী বাতচিত পক্কী করনে। কি মজা ! কি মজা ! কিত্‌না বড়া উৎসব হবে"।

– "চুপ কর। বিল্‌কুল চুপ," ঘোর বিরক্তির সঙ্গে লাইন কেটে দিয়ে, পড়ায় ফিরে গিয়েছিল শ্রীতমা।

কিন্তু কয়েকদিন পর, পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে মায়ের কাছে শ্রীতমা শুনেছিল, চয়ন-চন্দন সেদিন নিছক ঠাট্টা করে কথাগুলো বলে নি। এক মাসের মধ্যে বাস্তবিকই ওর বিয়ে। পাত্র সঞ্জয় মুখার্জী। ইতিমধ্যে পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সব পাকা করে ফেলেছেন গৌরী আর তাঁর বৌদি।

– "কিন্তু আমার পড়া", বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল শ্রীতমা।

– "পড়াশোনা যেমন চলছে তেমনি চলবে। এখানেই এম. এ. -তে ভর্ত্তি হবে তুমি", গৌরী বলেছিলেন এবং তারপর ঠাট্টার সুরে বলেছিলেন, "অবশ্য বি. এ. পরীক্ষাটাতে যদি উৎরে যাও তবেই"।

পরীক্ষার ফল বেরোতে দেখা গিয়েছিল, শ্রীতমা সসম্মানে, প্রথম শ্রেণীতেই উৎরেছিল বি. এ. পরীক্ষায়। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল সে।

(চলবে)

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায় – জন্ম বারাণসী শহরে। দীর্ঘকাল মেলবোর্ণ শহরের বাসিন্দা। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ.। মেলবোর্ণের মনাশ ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটর সায়েন্সে ডিপ্লোমা। বিভিন্ন সরকারী রিসার্চ বিভাগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ও অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন। দেশ, সানন্দা, আনন্দবাজার পত্রিকা, নবকল্লোল এবং বর্তমান সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা। উপন্যাস এবং ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে শারদীয় দেশ, সানন্দা ও আনন্দলোকে। অবসর সময়ে বই পড়তে ভালবাসেন। ভালবাসেন ভ্রমণ। ছন্দসীর প্রকাশিত গ্রন্থ – অভিযান (আনন্দ), মায়াজাল (আনন্দ), ছায়া পরিসর (লাল মাটি প্রকাশন), নির্বাচিত গল্প প্রথম ভাগ (দাশগুপ্ত পাব্লিশার্স) এবং Seven Favourite Stories – translation of seven short stories by Sirshendu Mukhopadhyay (Dasgupta Publishers)। ওয়েব সাইট : www.bando.com.au

ধারাবাহিক

রমা জোয়ারদার

চা-ঘর

পর্ব ১৪

[পূর্ব কথাঃ প্রতিদিনের মত সেদিনও সকালে রঘু সীতারামকে নিয়ে বাজারের ফর্দ করছিল। তখন সঞ্জু ফোন করে জানালো, ওর মা খুব অসুস্থ। রঘু তখনই ওদের বাড়ি গিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে যশোদাকে কালিচক হাসপাতালে ভর্তি করল। চিকিৎসার ফলে ক'দিনের মধ্যে যশোদা ধীরে ধীরে সুস্থ হল। বকুল ফোন করে জানালো ও এখন টিভি সিরিয়ালে কাজ করছে, তাই আসতে পারছে না। কিন্তু সে অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভাই আর মায়ের জন্য রঘুর অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিল।

ওদিকে উচ্চ-মাধ্যরমিক পরীক্ষা সামনে এসে যাওয়ায় রঘু ও তার বন্ধুরা ত্রিকোণ পার্কে রোজ একত্রে বসে মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। এমন সময় বড়দিনে নিখিলেশ এলো সেখানে। সবাইকে কেক ইত্যাদি খাইয়ে পড়াশোনার জন্য উৎসাহিত করল। তারপর রঘুকে নিয়ে বীরেশ্বর মল্লিকের বাড়ি গিয়ে বলল – মাস্টারমশাই অনুমতি দিলে সে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর রঘুকে দিল্লী নিয়ে গিয়ে সেখানকার কলেজে পড়াতে চায়। নিখিলেশের এই প্রস্তাবে বীরেশ্বরবাবু খুব খুশি হলেন আর রঘু আবেগে আনন্দে একেবারে আপ্লুত হয়ে গেল।]

দিল্লী থেকে ট্রেনে চড়ে সোজা হাওড়া, আর হাওড়া থেকে বাসে চেপে সোজা কালিচক। জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি। কিন্তু রঘুর মনে বসন্তের ফুরফুরে বাতাস বইছে। প্রায় তিন মাস পর সে কালিচক ফিরছে। তার চিরচেনা সেই জায়গা, সেই মানুষগুলো, সেই চা-ঘর ! হাসি-কান্নার দিনগুলো, একটু একটু করে বড় হওয়া – কত কথা মনে ভীড় করে আসছিল ! কালিচক ছেড়ে দিল্লিতে না গেলে সে হয়তো বুঝতেও পারত না যে এই ছোট্ট জায়গাটার এত মূল্য আছে তার জীবনে ! তার ফেলে আসা এত কষ্টের জীবনটার প্রতি তার এতখানি ভালোবাসা জড়িয়ে আছে ! মাস্টারমশাই, জিতেনদাদু, অঙ্কিত, বকুল আরও সব চেনা পরিচিত এখানকার মানুষদের উপর তার এতটা টান আছে ! দু-দিন বাদে হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরোবে। সেটা মনে পড়লেই ভয়ে বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ যে করছে না, তা নয় ! কিন্তু এই মুহূর্তে সবার সাথে দেখা হওয়ার উত্তেজনা অনেক বেশি। কত গল্প জমে আছে !

মনের খুশি রঘুর মুখে চোখে উপচে পড়ছিল। কিন্তু কালিচকে চা-ঘরের স্টপেজে নেমেই রঘুর মুখের হাসি উবে গেল। কয়েক হাত দূরের চা-ঘরের দিকে তাকিয়ে রঘু দেখল, দোকানের সামনে শুধু রুক্ষ মাটি আর ধুলো। দিল্লী যাবার সময় দোকানের সামনে যে বাগান দেখে গিয়েছিল সেখানে এখন কতগুলো শুকনো ডাল-পালা সেই বাগানের স্মৃতির কঙ্কাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ার, টেবিল কিছু নেই। দোকান ঘরটা একটা পরিত্যক্ত বাড়ির মত নিঝুম, নিশ্চুপ হয়ে আছে। মনে হচ্ছে অনেক দিন সেখানে উনুন জ্বলেনি। চা, পকোড়া কিছুই বানানো হয়নি !

চা-ঘরের পাশের জমিতে দাঁড় করানো নতুন ঝকঝকে সাইনবোর্ডের নামটা চোখে পড়ল – "গ্রীন রেসর্ট" ! জমিতে হৈ হৈ করে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। রেসর্ট-এর বিল্ডিং দিব্যি মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। হাতের ছোট স্যুটকেসটা টানতে টানতে রঘু পায়ে পায়ে চা-ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দোকানের দরজা সামান্য ফাঁক করে খোলা। সেখানে হাত রাখতেই ভিতর থেকে সীতারাম বেরিয়ে এল। রঘুকে দেখে একেবারে চমকে উঠল – "আরে রঘু ! তুই ?" তারপর স্যুটকেসের দিকে নজর পড়তেই জিজ্ঞাসা করল – "এখন কি সোজা দিল্লী থেকে আসছিস নাকি ?" সম্মতি সূচক মাথা নেড়ে রঘু বলল – "হ্যাঁ। কিন্তু চা-ঘরের এই অবস্থা কেন ?" সীতারাম দরজাটা পুরো খুলে ধরে বলল – "আয়, ভিতরে আয়। বোস। সব বলছি।"

ঘরে ঢুকে রঘু হাতের স্যুটকেসটা নামিয়ে রেখে একবার চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘরটা ভালো করে দেখল। কত বছর ধরে এটাই তার বাড়ি ছিল ! এখানেই তার প্রতিদিনের খাওয়া শোওয়া, একটু একটু করে বড় হওয়া। অথচ এই বাড়ির উপর তার একটুও অধিকার নেই! এই ঘরটা নিয়ে যে যা খুশি করতে পারে, রঘু তাতে কোনো বাধা দিতে পারবে না। পরিত্যক্ত

রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর – কে জানে কতদিন পরিস্কার করা হয়নি ! রেস্টুরেন্টের এই বড় জায়গাটা তুলনামূলক ভাবে একটু পরিস্কার। বেশ কতগুলো চেয়ার-টেবিল এখানে ওখানে জড়ো করে রাখা আছে। কোনে একটা টেবিলের উপর একখানা মাটির কুঁজো আর সামান্য কিছু বাসন-কোসন। ওই কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল ভরে রঘুর দিকে এগিয়ে ধরে সীতারাম বলল – "যা গরম ! একটু জল খা।" জলটা হাতে নিয়ে রঘু ঢকঢক করে পুরোটা খেয়ে নিয়ে গেলাসটা টেবিলের উপর রেখে একটা চেয়ারে বসে বলল – "সীতারামদা, এবার বল !"

সীতারাম নিজের মত করে মোটামুটি গুছিয়ে রঘুকে যা জানালো তার কিছুটা রঘু দিল্লী যাবার আগেই দেখে গিয়েছিল। যখন থেকে জিতেন দাস নিয়মিত চা-ঘরে আসতে পারছিল না, তখন থেকেই ব্যবসার অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। তারপর তো রঘুও শুধু সকালটুকুই থাকত। বিকেলে জিতেন দাসের ভাইপো দেখাশোনা করত। কিছুদিনের মধ্যে পেট্রোল পাম্পের মিহির দত্তের সাথে ভাইপোর খুব ভাব হয়ে গেল। সন্ধ্যের পর, দোকান বন্ধ করার আগে আগে ওনাদের দুজনের মধ্যে প্রায়ই অনেক গল্প-গাছা হত। দোকানের সবাই জানে ওই মিহির দত্তই নানারকম লোভ দেখিয়ে জিতেন দাসের ভাইপোকে পুরোপুরি নিজেদের দলে টেনে নিয়েছিল ! আর ভাইপোও ভিতরে ভিতরে চা-ঘর তুলে দেবার দলে যোগ দিয়েছিল ! ফলে চা-ঘরের অবস্থা ক্রমশ আরো খারাপ হচ্ছিল। জিতেন দাস সব বুঝেও একটা আশা নিয়ে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছিল। সে চা-ঘর বিক্রি করতে চায়নি। ভেবেছিল, রঘুর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর সে এসে ভালো ভাবে চা-ঘরের হাল ধরবে। তখন জিতেন দাস আর রঘু মিলে আবার দোকান টাকে ভালো ভাবে চালাবে।

সীতারাম বলল – "কিন্তু সেটা তো হল না। তুই দিল্লী চলে গেলি !" খচ্ করে একটা কষ্ট মেশানো অপরাধ বোধ কাঁটার মত রঘুর মনে বিঁধে গেল। সীতারাম বলে চলেছিল – "মা-জীর শরীর খারাপের জন্য বাবুর মনের জোর এমনিতেও কমে গেছিল। তার উপর বন্ধু-বান্ধবেরা সব বলতে লাগল – পাশেই গ্রীন রেসর্টের অত সুন্দর নতুন চকচকে রেস্টুরেন্ট হচ্ছে, কাজেই লোকজনরা ওটাতেই যাবে। চা-ঘরের এই মান ইজ্জত আর থাকবে না। অন্যদিকে ঝুনঝুনওয়ালাও চা-ঘরের জন্য ভালো দাম দিতে চাইল। বাবু বললেন – "আমার দোকানে এতদিন যারা কাজ করেছে, তাদেরকে তোমার রেসর্টে চাকরি দিতে হবে। বাবুর কথা ওরা মেনে গেল। তখন বাবু একেবারে লেখাপড়া করে চা-ঘর বেচে দিয়ে মা-জীকে নিয়ে হরিদ্বারে ওনার গুরুজীর আশ্রমে চলে গেল।" রঘু একটু চমকে গিয়ে বলে উঠল – "একেবারে হরিদ্বার ? তাহলে তো আর দেখাই হবে না !" সীতারাম বাধা দিয়ে বলল – "না, না, দেখা হবে। বাবু অনেক আশা করে আছে তুই হরিদ্বারে ওনার সঙ্গে দেখা করতে যাবি।" এর পর মুচকি হেসে যোগ করল – "জানিস তো, বাবু এতদিন পর একটা মোবাইল ফোন কিনেছে। সেই নম্বরটা তোকে দিতে বলে গেছে। জানে তুই যোগাযোগ করবি !"

সীতারামের কথা শুনে রঘুর দু-চোখে জল ভরে এল ! মনে পড়ে গেল, দিল্লী যাবার আগে নিখিলেশ আর মাস্টার মশাই জিতেন দাসের সাথে কথা বলতে গিয়েছিল। রঘুও সঙ্গে ছিল। ওর দিল্লী যাবার প্রস্তাব শুনে জিতেন দাস ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে বলেছিল – "একেবারে দিল্লী নিয়ে যাবেন ? তাহলে আমি ? খাওয়ালাম, পড়ালাম, এতদিন রাখলাম, এত বড় হল, পড়াশোনা শিখল, আর এখন নিয়ে চলে যাবেন ? কোথায় ভাবলাম, ও লেখাপড়া শিখে আমার দোকানটাকে আরো ভালো করে চালাবে ....!"

নিখিলেশ তখন বলল – "রঘুর মত একটা ছেলেকে আশ্রয় দিয়ে, বড় করে আপনি একটা সামাজিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কিন্তু ওর মত বুদ্ধিমান মেধাবী ছেলেকে আপনি কি চা-ঘরে আটকে রাখতে চান ?"

"দাশমশাই !" এবার বীরেশ্বর বাবু বললেন, "সুযোগ যখন এসেছে, তখন ছেলেটাকে এগিয়ে যেতে দিন। ও অনেক দূর এগোবে, অনেক বড় হবে। আর সেদিন ও সবাইকে যখন আপনার কথা বলবে, তখন সবাই আপনাকে ধন্য ধন্য করবে ! ওকে চা-ঘরে আটকে না রেখে যদি এগিয়ে যেতে দেন, রঘু চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে আপনার কথা মনে করবে।"

জিতেন চুপ করে কিছুক্ষণ রঘুর দিকে তাকিয়ে রইল ! ওই রকম একটা কাঠখোট্টা ব্যবসায়ী মানুষ, তারও চোখ দুটোতে জল এসে গিয়েছিল, যদিও সেটা চেষ্টা করে লুকিয়ে ফেলেছিল।

সীতারামের কথায় রঘুর অন্যমনস্ক ভাব কেটে গেল। ও বলছিল – "তুই জানিস, রঘু – আমি এখন এই যে এখানে আছি, সেটা ওই ঝুনঝুনওয়ালাদেরই নোকরি করছি ! বাবুর কথা মত ওরা আমাকে এখানে সিকিউরিটিতে চাকরি দিয়েছে।"

"বিরজু কোথায় ?" রঘু জানতে চাইল। সীতারাম জানালো, বিরজু আপাতত দেশে গেছে। রেসর্ট চালু হলে ওরও চাকরি হবে। রঘুকে সে আরো জানালো যে মুরারী আর বাদল বাজারের নতুন রেস্টুরেন্টে কাজ নিয়েছে। নিতাই আজকাল সব্জি বিক্রি করছে।

রঘু এবার সীতারামের কাছে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ও এখন অঙ্কিতদের বাড়ি যাবে। সেখানে স্নান খাওয়ার জন্য অঙ্কিতের মা বলে রেখেছে। তারপর সে বিকেলে মাস্টারমশাই-এর বাড়ি যাবে। সেখানেই থাকবে, কিন্তু আরো অনেকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। এরপর আবার কবে সে এখানে আসবে, সেটা তো সে নিজেও জানে না। বকুল জানিয়েছে, সঞ্জুরা এখন ঠিকানা বদলে নতুন পাড়ায় চলে গেছে। বকুল ওখানে একটা ছোট্ট সুন্দর ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। যশোদার সাথে দেখা করার জন্য সেখানে তো একবার যেতেই হবে !

তিনদিন পর বিকেলের দিকে ত্রিকোণ পার্কের পড়ুয়ার দল একত্র হয়েছে চা-ঘরে। আগের দিন রেজাল্ট বেরিয়েছে। সবাই খুব খুশি। রেজাল্ট সকলেরই ভালো হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে রঘু আর পূজা। ওরা সবাই মিলে প্ল্যান করেছে আজ রাতে একসাথে খাওয়া দাওয়া করবে। কিন্তু জায়গা তো একটা চাই। রঘুর ইচ্ছে খাওয়া-দাওয়াটা চা-ঘরেই হোক! সীতারামকে বলতেই সে বলল – "কোনো চিন্তা নেই। এখানে খাওয়া দাওয়া কর। আমি মিহিরবাবুকে বলে রাখব। কিছু অসুবিধা হবে না।"

আকাশে কালো মেঘ জমছে। দুপুর থেকেই আবহাওয়া বেশ থমথমে হয়ে আছে। মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে। একে একে ছেলে-মেয়েগুলো সব চা-ঘরে এসে জমা হল। সবমিলিয়ে ছয়জন – রঘু, অঙ্কিত, আনন্দী, পূজা, পল্লব আর সরিৎ। বাজারের নতুন রেস্টুরেন্ট যেখানে মুরারী আর বাদল এখন কাজ করে, সেখানে ওরা খাবারের অর্ডার দিয়ে এসেছে। বাদল আটটার সময় খাবার নিয়ে আসবে বলেছে।

সন্ধ্যের আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। সীতারাম চা-ঘরের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে বলল – "তোমরা দোস্তরা গপ্‌সপ্ কর। আমি পাশেই মিহিরবাবুর কাছ থেকে একটা ছোট্ট কাজ সেরে আসছি।"

আলো জ্বলতে রঘুর নজরে পড়ল ঘরটা আজ বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। ওরা আসবে বলে সীতারাম চেয়ার টেবিলগুলোও সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে।

সদ্য। স্কুল পাশকরা ছ'টা ছেলে-মেয়ে, নতুন জীবনের স্বপ্নে, আনন্দে, উত্তেজনায় ভরপুর ! একসাথে হতেই একেবারে হৈচৈ শুরু করে দিল। একটু বাদে হু হু আওয়াজে ঝড় শুরু হল! ঝড়ের তাণ্ডবে গাছপালা সব একেবারে লণ্ডভণ্ড হতে লাগল। ওরা তাড়াতাড়ি করে চা-ঘরের সব দরজা জানলা বন্ধ করে দিল। কিন্তু তাতেও চা-ঘর যেন থরথর করে কাঁপছে বলে মনে হচ্ছিল। কে যেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল – "হ্যাঁ রে, ঘরটা ভেঙ্গে পড়বে না তো ?" রঘু গম্ভীর ভাবে বলল – "ভেঙে পড়তেই পারে। খুব একটা শক্ত পোক্ত তো নয় !" রঘুর কথা শেষ হতে না হতেই চা-ঘরের ছাদে বেশ ভারি কিছু একটা পড়ার জোর আওয়াজ হল। সক্কলের মুখ শুকিয়ে গেল। কারো মুখে কথা নেই। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। অঙ্কিত সরে

গিয়ে রান্না ঘরের দরজা থেকেই ভিতরে উঁকি মেরে দেখে বলল – "রান্নাঘরের ছাদে কিছু একটা পড়েছে মনে হয়। ওদিকে কেউ যাস না।"

ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঘরের আলোগুলো থেকে থেকে দপ দপ করছে ! পূজা ভয়ে ভয়ে বলল – "আলোটাও যাবে মনে হচ্ছে !" অন্য দিক থেকে পল্লব উত্তর দিল – "ঝড়-বৃষ্টিতে ইলেকট্রিসিটি তো যেতেই পারে !" রঘু এবার বেশ জোর গলায় সবাইকে সাহস দিয়ে বলল – "তোরা ঘাবড়াস না। এই চা-ঘরে থাকাকালীন তোদের কারো কোনো ক্ষতি হবে না !"

ঝড়ের বেগ ক্রমশঃ কমছে, আর বৃষ্টির তেজ বাড়ছে ! তারপর একসময় ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেল, বাদল খাবার নিয়ে এল, আর সবাই মিলে হৈচৈ করে সেই সব খাওয়াও হল। কিন্তু আজ সন্ধ্যে থেকেই রঘু বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল ! দু-বছর আগে মাধ্যমিক পাশের পর যে ফিস্টি হয়েছিল, রঘুর বারবার সেসব কথাই মনে পড়ছিল ! সেই মানুষগুলো যারা সেই ফিস্টের আয়োজন করেছিল, আর তাকে আরো এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ দিয়েছিল, তাদের কথাও রঘুর মনে হচ্ছিল ! তখন এই চা-ঘর কেমন জমজমাট ছিল !

রঘু মাস্টারমশাইকে বলে এসেছে, আজ রাতে সে এখানেই থাকবে। বীরেশ্বর বাবু তাইতে একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। রঘু বলল – "চিন্তার কিছু নেই মাস্টার মশাই। সীতারামদা তো ওখানেই থাকে। একটা রাত না হয় আমিও থেকে যাব। এটাই তো চা-ঘরে আমার শেষ রাত কাটানো। এরপর আমি যদি বা আসি, চা-ঘর তো আর থাকবে না !" এ কথার পর বীরেশ্বরবাবু আর আপত্তি করেননি !

রাতে আনন্দীকে নেবার জন্য গাড়ি এসেছিল। ওই গাড়িতে সে সবাইকে তুলে নিল। বলল, এক এক করে সবাইকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। সবার শেষে নিজে গাড়িতে ওঠার আগে দৌড়ে রঘুর কাছে এসে বলল – "পুজোর ছুটিতে আমি দিল্লী আসব। তুই একা একা মামার আদর খাবি, সেটা হতে দেবো না !"

বন্ধুরা চলে যেতেই হঠাৎ করে চারিদিক নিঝুম হয়ে গেল। দরকার না পড়লে সীতারাম খুব একটা কথা বলে না। সে নিজের আর রঘুর বিছানা করে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। রঘুর ঘুম আসছিল না। চা-ঘরে আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত কত ঘটনা, কত টুকরো টুকরো সব স্মৃতি মনের মধ্যে ভীড় করে আসছিল। জানলার বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। সেই ছোটবেলার মত চাঁদের মধ্যে আজ আবার তার মায়ের মুখটা দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আকাশে আজ চাঁদ, তারা কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ঝড়ে বিধ্বস্ত নিম গাছটা অন্ধকারে একলা চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল । রাতের নিরিবিলিতে চা-ঘরের সাথে মনের কথা বলতে বলতে কখন যেন সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে চা-ঘর থেকে বেরোতেই রঘু দেখল, নিমগাছের একটা বড় ডাল আগের দিনের ঝড়ে ভেঙে চা-ঘরের রান্না ঘরের ছাদে গিয়ে পড়েছে। ছাদটা একটু ফেটেও গেছে। সীতারাম বলল – "ও সব নিয়ে আর ভেবে কি হবে ? সামনের সপ্তাহে তো এ বাড়িটাই ভেঙে ফেলবে !"

* * * * *

মাস্টার মশাইএর বাড়ি থেকে খাওয়া দাওয়া করে রঘু রওনা হল হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশে। এবার কালিচক থেকে বাসে করে হাওড়া। হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে দিল্লী ! অঙ্কিত আর সরিৎ ওকে বাসে তুলে দিয়ে পাশেই চা-ঘরের সামনে নিম গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। বাসের সীটে বসে রঘু দেখল ডাল-ভাঙ্গা নিম গাছের মাথায় হাল্কা এক টুকরো মেঘ ! সেই মেঘের মধ্যে তার ছোটবেলায় দেখা জিনির মুখ। সে যেন হাসিমুখে রঘুর দিকে তাকিয়ে বলল – "তুমি আমার কাছে মা

চেয়েছিলে। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়! তাই তার বদলে তোমাকে একটা মামা দিলাম। আর স্কুলে যেতে চেয়েছিলে, তার বদলে তোমার কলেজে যাবার ব্যবস্থা করে দিলাম !"

বাসটা ছেড়ে দিল। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে রঘু জিনির মুখটা দেখবার চেষ্টা করল ! তারপর সরিৎ আর চা-ঘরের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে থাকল ! বাসের গতি বেড়ে চলল। রঘুর সামনে এখন প্রসারিত আলোকোজ্জ্বল পথ! ওকে অনেক দূর যেতে হবে !

– (সমাপ্ত) –

রমা জোয়ারদার – দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলন ঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

ধারাবাহিক

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

চল নিধুবনে

পর্ব ৩

পরদিন সকালে বিদেশের বাড়ি থেকে ফিরছিল নবীনা। মীরার বাড়ির পাশ দিয়েই যেতে হয়। মীরার গলা ভেসে আসছিল জানলা দিয়ে। একমনে ভজন গাইছে মীরা। ওর ঠাকুর পুজো চলছে। একবার থমকে দাঁড়ায় ও। ভাবে ওর বাড়িতে ঢুকবে কী না। তারপর পা গুটিয়ে নেয়। এসময়ে ঢুকলে ওর পুজোয় ব্যাঘাত হবে।

মীরার জীবন ভারি অদ্ভুত ! সে গল্প ও শুনেছিল চিত্রাদির কাছে। মীরার নিজের বাড়ি বসিরহাটে। ওর আসল নাম সুধাময়ী। ও নাকি একদম ছোট থেকেই পুজোর উৎসবে, অনুষ্ঠানে ভজন গাইত। ওর ভজন শুনে একজন বড় শিল্পী ওকে গান শেখাতে চান। ও তার কাছেই নাড়া বেঁধে গান শিখতে শুরু করে। একেবারে সাধারণ পরিবারের মেয়ে। তাই গ্র্যাজুয়েট হবার পর ওর বাবা মা জোর করে ওর বিয়ে দেন। বেশ অবস্থাপন্ন ঘরেই ওর বিয়ে হয়। বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলায় এসে ওর বর ওকে বাপের বাড়িতে রেখে যায়। অভিযোগ করে যে মীরার বাবা সবকিছু লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। মীরা পাগল। স্বামীকে ও বলেছে, "আমি কৃষ্ণ প্রেমে মজেছি। তুমি আমাকে ছুঁয়ো না। কথা না শুনলে আত্মহত্যা করব।"

বিবাহবিচ্ছেদের পর মীরা নতুন করে সঙ্গীত সাধনা শুরু করে। তার সঙ্গে বাড়তে থাকে ঈশ্বরচিন্তা। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হলে ওর নতুন নামকরণ হয় মীরা। নাম ছড়াতে থাকে চারদিকে। গানের জন্য ঘন ঘন ডাক আসে। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি, একজন মানুষ যা যা চায় সব পায় ও।

ঠিক তখনই এই জায়গার সন্ধান পায় মীরা। আর সব ছেড়েছুড়ে চলে আসে এখানে। তবে চলে আসার সঠিক কারণ কেউ বলতে পারে না। এখন ওর সঙ্গে থাকে তুলসী। তুলসী আরেক কৃষ্ণ ভক্ত। মীরার গানের দলে তুলসী খঞ্জনি বাজাত। এখনও মীরা গাইলে ও খঞ্জনী বাজায়। মীরা মাঝেমাঝেই গান গাইতে গাইতে অন্য জগতে পৌঁছে যায়। তখন ওকে আবার স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনার দায় তুলসীর। তাছাড়া মীরার রান্নাবান্না, বাড়ির ব্যবস্থাপনা সব কিছুই এখন তুলসীর ঘাড়ে। তুলসীই ওকে নজরে নজরে রাখে।

মীরার বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওর কথাই ভাবছিল নবীনা। কিন্তু আচমকা ওর বাড়ি থেকে আসা একটা শব্দ শুনে থমকে গেল ও। ভারি কিছু একটা পড়ে যাবার আওয়াজ, মীরার গান শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে দরজা সবার খোলাই থাকে। হুড়মুড় করে বাড়ির ভেতরে ঢুকল নবীনা।

মীরা মাটিতে পড়ে আছে, আর তুলসী ওর মুখেচোখে জলের ছিটে দিচ্ছে।

"কী হয়েছে ? মীরা পড়ে গেল ?"

তুলসী ওকে দেখে শক্তি ফিরে পায়। "দেখুন না, দিদি গান গাইতে গাইতে হঠাৎ পড়ে গেল।"

"তুমি থাকো। আমি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনছি।"

এবারে অদ্ভুত কান্ড ঘটছে। বিদেশের শরীর খারাপ হল। ও ভাগ্যিস গিয়ে পড়েছিল। আবার মীরার বেলাতেও ওই উপস্থিত। ডাক্তারবাবু খুব দ্রুত তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লেন ওর সঙ্গে। উনি মীরার বাড়ি প্রায় আসেন। তবে দেকভালের তেমন সুযোগ পান না। মীরা কখনও কিছু বলে না। তুলসী কিছু জানালে মাঝেসাঝে উনি ওষুধ দিয়েছেন। আসলে মেয়েটা ভালোরকম জেদি। নিজের শরীরের খুবই অযত্ন করে। আর কাউকে কিছু করতে দিতেও চায়না। মীরার গানের উনি খুবই ভক্ত। তাই গান শোনার জন্য ওর বাড়ি আসেন।

ডাক্তারবাবু পথে যেতে যেতে বলছিলেন, "আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে ওর ব্লাডটেস্ট করিয়েছিলাম। জানো, ভালোরকম রক্তাল্পতা আছে। মনে হয় সেটাই বেড়েছে। এই অবস্থার থেকে উন্নতি না হলে ও বাঁচবে না। আপাততঃ কোনও নার্সিংহোমে বা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে রক্ত নিতে হবে। এখান থেকে না নড়লে রক্ত পাবার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ও কথা শুনছে না। যেকোনও দিন যেকোন সময় ওর বড় কোন বিপদ ঘটতে পারে।"

নবীনা বলে, "আর দেরি করলে হবেনা। এবার শান্তদা এলেই ব্যবস্থা নিতে হবে।"

ওরা ঘরে ঢুকে দেখল, মীরা চোখ খুলেছে। তবে খুব ক্লান্ত। উনি নাড়ি, প্রেসার দেখে বললেন, "পালস রেট এত কম কেন ? প্রেসারও লো। তুলসী, তোমার দিদি খাওয়াদাওয়া ঠিকমত করছে ?"

তুলসী মাথা নিচু করে। "না। এখনও শুধু চা খেয়েই আছে। একটা বিস্কুটও পেটে যায়নি। পুজো করে খাবে।"

"বাড়িতে গুঁড়ো দুধ আছে ?" ডাক্তারবাবুর গলা গমগম করে।

তুলসী ঘাড় কাত করে।

"গরমজলে দুধ গুলে নিয়ে এসো। আর চারটে বিস্কুট আনো। আমার সামনে খাওয়াও। তারপর ওষুধ দেব।"

তুলসী উঠে যেতে, মীরা চিঁ চিঁ করে কী বলতে গিয়েও থেমে যায়।

মীরাকে দুধ বিস্কুট খাইয়ে ওষুধ দিলেন ডাক্তারবাবু। খেল ও। রুগীকে খানিক ধাতস্থ করে ও আর ডাক্তারবাবু ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। তুলসীর ওপর অর্ডার হয়েছে ঝুমুরদের থেকে ডিম নিয়ে রোজ একটা ডিমসেদ্ধ মীরাকে খাওয়ানোর। আরশিনগরে সামান্য অসুখেও ভয় হয়। চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নেই। সেখানে মীরা তো ভালই রোগ বাঁধিয়েছে।

মীরার কথা ভাবতে ভাবতে নবীনা একদম অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল। হুঁস ফিরতেই আবার পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করে ও। আপাতত ও ঝুমুরদের ওখানেই যাবে। তারপর ফোন করতে যেতে হবে নদী পেরিয়ে। পরে চিত্রাদি আর হেনাদির সঙ্গে একবার বসতে হবে ওকে। এখানে রুগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। বিদেশকেও একবার দেখিয়ে নিতে হবে। ওর শরীরও ঝামেলা করছে। মীরার ব্যাপারে দেরি করা যাবেনা। এখনই নার্সিংহোমে নিতে হবে। নাহলে বাঁচানো মুস্কিল।

কিন্তু গাড়ি না পেলে কিছুই হবে না। শান্তদার গাড়িটা পেলে সব সমস্যা মেটে। নদী পেরিয়ে গিয়ে শান্তদাকে একটা ফোন করতে হবে। নদীর ওপর একটা ব্রীজ আছে। তবে সেটায় পৌঁছতে অনেকটা হাঁটতে হয়। ও নদী হেঁটেই পার হবে।

তিনচারদিন বাদেই ওর ফেরার কথা। কিন্তু শেষ অবধি আটকেই গেল। বিদেশের জ্বর ছাড়ছে না। মীরার হাল ভাল নয়। তুলসী একা ভয় পাচ্ছে। চিকিৎসার কিছুটা ব্যবস্থা না করে ও যায় কী করে ?

বেলা থাকতে থাকতেই নদীর ওপারে গেল ও। শহরটা কেমন নিঃঝুম মত। অর্দ্ধেক দোকান সবসময়েই বন্ধ। তার ওপর ফোনের লাইন পাওয়া যায়না। কিংবা পেলেও কথা শোনা যায়না। বেলা একটা বাজে। অতিকষ্টে শান্তদাকে ধরল ও।

"হ্যাঁ আমি বলছি, নবীনা। কেউ কেউ অসুস্থ হয়েছে। আপনার গাড়ীটা কিছুক্ষণের জন্য পেলে কিছু দরকার মেটে। আর আপনার বন্ধুর নার্সিংহোমে যদি একটু বলে রাখেন।"

"ঠিক আছে দেখছি। আমি কাল আসব। তবে গাড়ি আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে যা করার করো।"

আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে, শান্তদা বড় কোন হলে আছেন। মিটিং চলছে হয়ত।অথচ একবারে আরশিনগরের প্রয়োজনের গুরুত্বটা বুঝে গেলেন।

ও আবার বলে "অত তাড়া নেই। কাল গাড়ি নিয়ে আপনি এলেও চলবে।"

কথাটা ভুল ছিল। গাড়ি নিয়ে যা করার করে ফেলতে হত। মীরার অবস্থা রাতেই খুব খারাপ হল। ভোরে তুলসী এসে ডাকছিল ওকে। একটু একটু করে আলো ফুটছে তখন। তুলসীর কান্না শুনে ও বুঝতে পারল আরশিনগরে মৃত্যু থাবা বসিয়েছে। না তার পায়ের আওয়াজ কেউ শোনেনি। একেবারে, "নিঃশব্দ চরণে"।

শেষ যাত্রার ধরন আরশিনগরে অন্যরকম। ডাক্তারবাবু থমথমে মুখে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দেবার পর খুব সুন্দর করে সাজানো হল মীরাকে। কোঁকড়ানো চুলগুলো সাপের ফণার মত মুখের চারিধার ঘিরে ছিল। আগুন রঙের একটা বাহারি শাড়ি জড়ানো হল গায়ে। শাড়ির আঁচল গলার পেছন দিয়ে ঘুরিয়ে সামনে এনে দেবার পর ভারি চমৎকার দেখাচ্ছিল ওকে। কপালে বড় একটা লাল টিপ আর গলায় লম্বা একছড়া তুলসীর মালা। তুলসীর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবু কাঁদছিলেন নিঃশব্দে। শেষযাত্রায় কাঁধ দিলেন। মীরার সঙ্গে ওনার কিছুদিন যাবৎ একটা যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। সেটাও ছেড়ে গেল।

ঝুমুর, মনুয়া ঠাকুরের প্রসাদ খেতে আসত মীরার কাছে। ওরা ফুলের মালা গেঁথে এনেছিল। পরাল মীরার গলায়। ফুল দিয়ে ঢাকা শরীর যেন হাওয়ায় ভেসে চলল নদীর ধারে। সুরেলা ভারি গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিলেন ডাক্তারবাবু। সবাই গলা মেলাচ্ছিল। নদীর চরায় শুইয়ে দেওয়া হল মীরার দেহ। এখানে কোন ডোম নেই, শ্মশান নেই। চরাতেই এককোণে শালু কাঠ কেটে এনে বিছানার মত সাজিয়ে দিল। মীরাকে তার ওপর শুইয়ে এক এক করে অনেকেই কাঠ সাজাল ওর শরীরের ওপর। কেউ বা ফুল ছড়াল। তুলসী কাঁদতে কাঁদতে কৃষ্ণনাম করছিল। নবীনা এগোয়নি। ঝুমুরের হাত ধরে ও দাঁড়িয়েছিল একপাশে।

হঠাৎ নবীনা টের পেল বাতাসে চন্দনের গন্ধ ভেসে আসছে, আর ওর শরীর ভারী হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। ও ঝুমুরের হাত ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল খানিকটা। চারপাশে কাঁসর ঘন্টা বাজছে। ধূপ ধুনোর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারিপাশ। ওর চোখ বোজা। কিন্তু ও অনুভব করছিল কোথাও কোন মন্দিরে আরতি হচ্ছে। আর ও সেখানে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ ছিল ও জানেনা। শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে জ্বর নামার মত কিছু হল।

ঝুমুর ডাকছিল ওকে। ওর চোখ আঠা দিয়ে আটকে গিয়েছে যেন। কিছুতেই খুলছে না।

ঝুমুর বলছিল, "দিদি তুমি একাএকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছিলে। তোমার কী ঘুম পেয়েছিল ? কী হয়েছিল গো ?"

"কিছু না। এমনি।" নবীনা দেখল ঝুমুরের চোখে স্পষ্ট অবিশ্বাস। কিন্তু ওর কিছু করার নেই। ওর কী হয় ও নিজেও জানেনা। তবে হুঁশ আসার পর ও কিছু কিছু মনে করতে পারে।

শান্তদার গাড়ি এসেছিল মীরাকে নিয়ে শেষযাত্রায় রওয়ানা দেবার আগের মুহূর্তে। আফসোস হচ্ছিল নবীনার। আগের দিন গাড়িটা এলে কী বেঁচে যেত মেয়েটা ? আবার ভয়ও পাচ্ছিল। শান্তদা না বলেন, "এই তোমার দেখে শুনে রাখা ?"

আশ্চর্য ! শান্তদা কী ওর ভাবনাটা টের পেলেন ? আগুন জ্বলে ওঠার ঠিক আগে উনি নিচু গলায় নবীনাকে বললেন, "আক্ষেপ করো না। যাওয়ার সময় এলে যেতে হয়। কোন কিছু দিয়েই তা আটকানো যায়না।"

ডাক্তারবাবু তখন গাইছিলেন, "আরো কত দূরে আছে সে আনন্দধাম।"

আরশিনগরে একটা অদ্ভুত নিয়ম আছে। কেউ মারা গেলে প্রতিটি পরিবারকে শোক পালন করতে হয়। তার নিয়ম

একটিই। ওই কদিন আরশিনগরের উৎসব মঞ্চে কেউ কোনও অনুষ্ঠান করতে পারবে না। জমায়েত হয়ে কারোর বাড়িতে অনেকে মিলে খাওয়াদাওয়া বা গানবাজনাও বন্ধ থাকবে। লাইব্রেরিতে সন্ধ্যার প্রার্থনায় অসুস্থ না হলে, যোগ দিতে হবে। এক সপ্তাহ এভাবে কাটলে "ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণ"এ সন্ধ্যায় একটি স্মরণসভা হবে। উপস্থিত সকলে মৃতের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন। কেউ ইচ্ছে করলে কবিতা বা যেকোন রচনা থেকে পঙতি পাঠ, অথবা গান করতে পারবেন।

তবে এসব কিছুই বাধ্যতামূলক নয়। ইচ্ছে নাহলে কেউ কোনওটাতেই উপস্থিত না হতে পারেন। তবে কোনও ভাবেই কেউ কোনও আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন বা তাতে যোগদান করতে পারবেন না। নবীনার পক্ষে একসপ্তাহ থাকা সম্ভব নয়। শান্তদাও ফিরবেন। কাজকর্ম মিটিয়ে আবার আসবেন উনি। ঠিক হল সুযোগ যখন আছে, নবীনা ওই গাড়িতেই ফিরবে। আর বিদেশ ওদের সঙ্গেই যাবে। শান্তদার বন্ধুর নার্সিংহোমে কদিন কাটিয়ে প্রয়োজনীয় সব টেস্ট করিয়ে ফিরবে ও। ওর যাওয়ার বা ডাক্তার দেখানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিলনা। গোঁজ হয়ে বসেছিল। একবার বলেওছিল, "এখনই এসবের দরকার নেই।"

কিন্তু শান্তদা বললেন, "প্রয়োজন আমাদের। কেননা ডাক্তারবাবু ছাড়া এখানে রোগী দেখার কোন লোক নেই। আর মীরার ঘটনার পর আমি কোন রিস্ক নিতে পারব না।" শান্তদাকে প্রতিবাদ জানিয়ে লাভ নেই, তাই বিদেশ চলেছে।

ঝুমুরদের খুব মনখারাপ। এমনিতে মীরাদি ওদের প্রিয় লোক ছিলেন। সে শোক তো আছেই। তার ওপর যোগ হয়েছে নবীনার চলে যাওয়া। বারবার ওরা বলছে, "এবারে তো তুমি আমাদের কাছে থাকলেই না। আবার এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ।"

নবীনা বলে, "এবারে তো অনেক বেশি থাকলাম। আমার স্কুলের চাকরিটা দেখছি তোদের জন্য যাবে। তখন কে খাওয়াবে আমায় ?"

"আমরা।" বলে, একগাল হাসে ওরা। নবীনার মনে হয় ওই মুখগুলো দেখার জন্য না ফেরাই ভালো। তবে আর বেশি দেরি হলে পিসিমনি চিন্তা করবে। সেটাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায়না।

আরশিনগরে আসার জন্য ওর মন ছটফট করে। আবার যাওয়ার জন্য একটা টান থাকে। ভারি অদ্ভুত দোটানায় থাকে ও। বোধহয় এজন্যই শান্তদা ওকে স্থায়ীভাবে এখানে থাকতে বারণ করেছিলেন। মীরার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় বড় ফাঁকা লাগল। বাড়ির দরজার হাঁসকল বাইরে থেকে লাগানো। শুধু সামনের তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলছে।

শান্তদা গাড়ি চালাচ্ছেন। ও পাশে বসে। বিদেশ পেছনের সিটে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। শান্তদা আস্তে আস্তে বললেন, "তুলসী আমায় বলছিল ওই বাড়িতে ও একা থাকতে পারবে না। ও আজ থেকে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে থাকবে।"

বেরোতে বেরোতে একটু দেরী হয়ে গেল। আরশিনগরে সন্ধ্যে নামছে। এসময় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে মীরা ভজন গায়। সারা পাড়ায় অনেকটা জুড়ে ওর সুরের হাল্কা আমেজ ভাসে। আজ তা একেবারেই নেই। গতকালও ছিল না। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে অনেকটা রাস্তা পেরোতে হয়। এর পরেই লোকালয় আসবে। বিদেশের কোনও সাড়াশব্দ নেই। ও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। গাড়ির দোলানিতে ঘুম আসছিল নবীনার। তবু ও চোখ না বুজে খাড়া হয়ে বসেছিল সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে। শান্তদাও কোনও কথা বলছিলেন না। নবীনার মনে হল উনি হয়ত মীরার কথা ভাবছেন।

# #

বাড়ি পৌঁছতে একটু রাত হয়ে গেল। পৌনে বারোটা বাজে। পিসিমনি একা থাকলে একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। তাই রাস্তা থেকেই শান্তদার ফোনে পিসিমনিকে নবীনা জানিয়ে দিয়েছিল যে ও আসছে। জেগে থাকার দরকার নেই। বাড়ির মোড়ে পৌঁছে ও ফোন করে নেবে আরও একবার।

আরশিনগরে এবার ও ফোন নিয়ে যায়নি। কী শান্তিতেই যে ছিল কদিন। কোনও ফোন আসছে না। হোয়াটস্ আপ, ফেসবুকের তো কথাই নেই। ওখানে ফোন নিয়ে যাবার কোন মানে হয়না। ফোনে চার্জ দেওয়াও যায়না, কেননা ইলেকট্রিক লাইনের কোন বালাই নেই। আর মোবাইলের টাওয়ার ওখানে নেই। সেই নদী পেরোলে শহর। সেখানে গিয়ে ফোন করতে হবে।

আরশিনগর জায়গাটা যেন পৃথিবীর ভূগোলের বাইরের একটা জায়গা। বড়সড়ো শিল্পের কাজকর্ম উঠে যাবার পর, পড়ে থাকা ওই অঞ্চলে কারা থাকে, কারা আসে, কারা যায়, তাই নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। মাঝে একবার সরকার থেকে খোঁজখবর হয়েছিল। শান্তদা ওদের তরফে গিয়ে কী বলে এসেছেন কে জানে ? আবার সবকিছু ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে।

ঝুমুর সেদিন বলছিল, "দিদি কোনদিন যদি এখান থেকে চলে যেতে বলে, মনুয়া, আমি, কোথায় যাব ?"

ও বলেছিল, "সে ভাবনা আমার। তুই ভাবছিস কেন ?"

কিন্তু সত্যি সত্যি তেমন কিছু হলে ও কী করবে নিজেই জানে না।

পিসিমনি দরজা খুলেই বলল, "আমি দাঁড়াতে পারছি না। খুব জ্বর। রুটি করেছিল নমিতা। ফ্রিজে তরকারি, দুধ আছে। খেয়ে নিস।"

বাথরুমে গিয়ে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে খুব অপরাধবোধ হচ্ছিল নবীনার। বয়স্ক মানুষটাকে নমিতার ভরসায় রেখে বারবার ও চলে যায়। এটা ঠিক হচ্ছে না। আজ ও আসবে বলে নমিতা আগেই বাড়ি চলে গিয়েছে। কোন কারণে ও না ফিরলে কী হত ?

পিসিমনিকে ওষুধ খাইয়ে, মাথায় কিছুক্ষণ জলপটি দিতে, জ্বর নামল। সকালেই ডাক্তার দেখাতে হবে। রাতে শুয়ে শুয়ে ঘুম আসছিল না ওর। পথের পাঁচালি পড়ছিল। বইএর একটা জায়গা ও বারবার পড়ে, ইন্দির ঠাকুরণের মারা যাবার অংশটুকু। কষ্ট হয়। তবু বড় ভালো লাগে। মাঝে মাঝে মনে হয়,মানুষের এই এগিয়ে যাওয়ার কী কোনও সীমা পরিসীমা নেই ? আরাম বাড়াতে গিয়ে শান্তি কমছে না তো ? আরশিনগরে পাখা নেই, গরমে হাতপাখাই সম্বল। আলো বলতে মোমবাতি বা ল্যাম্প। তবু তো খারাপ লাগেনা। দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ে। অথচ বাড়িতে ও পাখা, গ্যাস, আলো ছাড়া ভাবতেই পারেনা।

সকালে ডাকবক্সের চিঠিগুলো দেখছিল ও। সবই কাজের চিঠি। শুধু একটা বিদেশি খাম। ভেতরে একপাতায় বড় বড় করে লেখা, "আমি আসছি"। ও তাড়াতাড়ি খামটা বুকের ভেতর লুকিয়ে নিল। পিসিমনি দেখলে অযথা ভয় পাবে। ফোন, হোয়াটস্আপ সবেতেই ব্লক করে দেবার পর খামেতেই হুমকি পাঠানো হয়েছে। জীবনেও শুধরোবে না লোকটা।

পিসিমনিকে আজ ও উঠতে দেয়নি। রবিবার। তাড়া নেই। নমিতা কাজে এসেছে।ওকে দিয়ে কুটনোগুলো কাটিয়ে নিল। নিজেই রাঁধবে। তার আগে একটু সুজি বানালো। গরমগরম সুজি খেতে পিসিমনি খুব পছন্দ করে। ওর স্কুলের কাজের ব্যাপারে পিসিমনির খুব চিন্তা থাকে। সুজি খেতে খেতেই বলল, "তোকে বড়দি ফোন করেছিলেন। এসেই যোগাযোগ করতে বলেছেন।"

"তুমি বলেছ নাকি যে আমি বাইরে গেছি ?"

"না। শুধু বলেছি ফোন তুই ফেলে গেছিস।"

"থাক। পরে ফোন করব। তুমি রেডি হয়ে নাও। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।"

"দ্যুত্! তুইও যেমন। এই সামান্য জ্বরে কেউ ডাক্তারের কাছে যায়? একগাদা খরচা বাঁধা। নানা রকমের টেস্ট করাতে বলবে। এ দু'দিনে সেরে যাবে। না সারলে যাব।"

"কথা বাড়িও না। নমিতা বলেছে, আমি যাওয়ার পর থেকেই জ্বরে ভুগছ। তাড়াতাড়ি তৈরি হও। আমি গাড়ি ডাকব।"

পিসিমনি গজগজ করতে করতে বাড়ির ভেতরে যায়। ও মনেমনে ভাবে, মীরার ঘটনায় জোর শিক্ষা হয়েছে। কোনও রুগীর ক্ষেত্রে আর একবেলাও দেরী করবে না ও।

পিসিমনি ঠিকই বলেছিল। ডাক্তার একগাদা টেস্ট লিখে দিলেন। এক এক করে সব করাতে হবে। ভালোরকম খরচ হবে। তবে টাকা পয়সা নিয়ে তেমন ভাবে না নবীনা। বাবা মারা যাবার পর একটু দিশেহারা অবস্থা হয়েছিল ওদের। শক্ত হাতে পিসিমনি সবটা সামলায়। এখনও ব্যাঙ্কে টাকাপয়সা গয়নাগাটি যা আছে, হঠাৎ কোনও বিপদ-আপদ ঝড়-ঝাপটা এলে সামলে নিতে পারবে ওরা।

ওদের বাড়িটা বেশ বড়। দোতলা বাড়ি। হলগুলো বিশাল। বাবার নীচ তলায় চেম্বার ছিল। বাবা চলে যাবার পর বাড়তি ফার্নিচার সব বিক্রি করে টানা হলের একপাশের স্টোররুমটাকে কিচেন বানিয়ে ওরা দোতলায় উঠে এসেছে। নীচের তলাটায় একটা ডাবল রুম আর একটা সিঙ্গল রুম এর ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে বেশ ভালো টাকাই আয় হয়। সেই টাকাতেই মূলতঃ সংসার চলে। বাড়তি কোনও খরচা করতে হলে বাবার রেখে যাওয়া টাকার সুদে হাত পড়ে। ওর টাকাটা ও ব্যাঙ্কে রাখে। দরকার মত খরচ করে।

নমিতা সবকাজেই পিসিমনিকে সাহায্য করে। সারাদিন থাকে। খাওয়া দাওয়াও ওদের সঙ্গেই করে। তাই ও না থাকলে নমিতা পিসিমনিকে সঙ্গ দেয়। ও বুঝতে পারছে আস্তে আস্তে বাড়ি, ঘর, স্কুল, সবকিছুর ওপরই ওর টান কমে যাচ্ছে। পড়াতে ভালো লাগে। কিন্তু তারপরে স্কুলের আবহাওয়ায় যে পলিটিক্স থাকে, সেটা ও একদমই নিতে পারেনা। পিসিমনি যতদিন আছে হয়ত এভাবেই চলবে। তারপর কী হবে কে জানে?

কাল থেকেই স্কুলে যাওয়া। তার আগে বড়দিকে একটা ফোন করে নেওয়া দরকার। ফোন অনেকক্ষণ ব্যস্ত থাকার পর ধরলেন উনি।

নবীনার পার্মানেন্ট পোস্ট নয়। কিন্তু স্কুল ওকে ছাড়ে না। তাই মাঝেমাঝেই ওর পজিসান পালটে যায়। ওর বিষয় ইংরাজী। কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয় ছাড়া প্রায় সবকিছুই ওকে পড়াতে হয়। সেরকম কিছু নিয়ে কথা বলতে হবে ভেবে ফোন করেছিল ও। যা শুনল তা খুবই মারাত্মক। লোকরঞ্জন বাবু নাকি স্কুলে এসেছিলেন ওর খোঁজে। ওনার সৎ মেয়ে ঝুমুরকে হায়ারসেকেণ্ডারি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর পর থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না। উনি কোন সূত্রে জানতে পেরেছেন যে নবীনার সঙ্গে ওর খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। তাই ওর কাছে কিছু খবর পাওয়ার আশা নিয়ে এসেছিলেন।

বড়দি বলছিলেন, "লোকটাকে দেখে আমার রাগে গা জ্বলছিল। তবু আমি খুব ভদ্র ব্যবহার করেছি। বললাম, নবীনার সঙ্গে সব মেয়েদেরই ভালো সম্পর্ক। আপনার মেয়ের হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ওকে জড়াচ্ছেন কেন? আর এবার কিছু জানতে হলে ওর মাকে পাঠাবেন। আমরা গার্জেন ছাড়া কাউকে এন্টারটেন করব না।

গার্জেন হিসাবে ওর মার নামই আছে রেজিস্টারে। তা সেসব কানে নিলনা। তোমার বাড়িতেও চলে যেতে পারে। লোকটা মোটেই সুবিধার নয়। তাই তোমাকে সাবধান করে দিলাম।"

শুনতে শুনতে ওর মনে হচ্ছিল বাড়ি ফিরলেই নানা ঝামেলা শুরু হয়। তার থেকে বাড়ি না ফেরাই ভাল। তারপরেই মনে হল, দিনদিন ও খুব স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে। পিসিমনিকে ও ভুলে গেল কী করে? বরাবর যে মানুষটা ওকে দেখেছে,

তাকেই বুড়ো বয়সে ও ছেড়ে চলে যাবে ? না এ চিন্তা ওকে মানায় না। পিসিমনি যদি একবার টের পায় ও এরকম ভাবছে, সে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।

গতকাল পোস্টবক্সে পাওয়া চিঠিটা নিয়ে একবার উকিলের কাছে যাবে ভাবল। পরক্ষণেই মনে হল কী লাভ ? ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর কেউ যদি এধরণের হুমকি দেয়, সেটা তারই বোকামী। আসলে শৈবালের সঙ্গে ওর চিন্তাভাবনার রুচিগত পার্থক্য আছে, আর সেটাতেই বাঁধছে। তাও একবার শান্তদাকে ফোন করে জানিয়ে রাখলে হয়। একটু সঙ্কোচও হচ্ছিল। মানুষটা নানা বিষয় নিয়ে একেবারেই নাজেহাল হয়ে থাকে। তার মধ্যে ওর সমস্যাটা একেবারেই ব্যক্তিগত। এটাতে ওনাকে না ঢোকালেই ভালো। কিন্তু পারছে কই ? ঠিক ছটা নাগাদ শান্তদা ফোন করলেন। ও তখন ছাদে পায়চারি করছে।

ও ভাবতেও পারেনি উনি এমন একটা খবর দেবেন। বিদেশ নার্সিং হোমের সঙ্গে একেবারেই কোঅপারেট করেনি। শান্তদার বন্ধু জানিয়েছেন, ওরা কেউ না এলে চলবে না। বিদেশ গতকাল রাতে লিকুইড কিছু খেয়েছিল। সকাল থেকে তাকে কিছু খাওয়ানো যায়নি। না খাবার জেদ ধরে বসে আছে। শেষপর্যন্ত তারা স্যালাইন দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে তারা কেউ না গেলে সেটা শুরু করতে পারছেন না।

শান্তদা ওকে বললেন, "সব তো শুনলে, তুমি যাবে আমার সঙ্গে ? কেন ছেলেটা এমন করছে বলো তো ?"

আকাশে অল্প অল্প কালো মেঘ ভাসছিল। ও শান্তদাকে বলল, "বৃষ্টি আসছে। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। জোরে জল পড়লে গাড়ি চালাতে অসুবিধা হবে। আমি যাব। তৈরি হয়ে নিচ্ছি।"

ওর একদম বেরোবার ইচ্ছে ছিলনা। পিসিমনির শরীরও ভালো নেই। তবু নমিতাকে বাড়ি যেতে বারণ করে, পিসিমনির কাছে রেখে ও শান্তদার সঙ্গে রওয়ানা দিল। নার্সিং হোমটা হাজরার কাছেই। ওখানকার প্রধান ডাক্তার দেব, শান্তদার ছোটবেলার স্কুলের বন্ধু। উনি নার্সিংহোমেই ছিলেন।

বিদেশ চুপচাপ নিজের বেডে শুয়েছিল। ওদের দেখে নড়েচড়ে উঠে বসল। শান্তদা দেবের চেম্বারে গেলেন কথা বলতে। ও চেয়ার টেনে বিদেশের পাশে বসল।

"খাচ্ছ না কেন ?" নবীনার কথা শুনে বিদেশ তাকাল ওর দিকে।

"ভাল লাগছে না। আমি ভাবছিলাম তুমি আসবে। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে।"

"কোথায় যাবে ? তোমার এখানে টেস্ট হবে। ডাক্তার তোমাকে ছাড়বেন না।"

"তোমরা বললে ছেড়ে দেবেন। টেস্ট করিয়ে কী হবে ? আমার কিছু হয়নি তো।"

"সে উনি বুঝবেন। ওনাদের কথা শোন। না খেলে স্যালাইন দেবেন ওরা। সেটা কী ভালো হবে ?"

"আর খেলে আমায় এখান থেকে নিয়ে যাবে তো ?"

নবীনা হাসে। "তোমার টেস্ট হোক। সুস্থ হলে তোমায় আমি নিজে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।"

অন্য দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবে বিদেশ। প্রায় তিন মিনিট ওইভাবে থাকার পর বলে, "ঠিক আছে। আমায় তারপর নিয়ে যাবে। কথা দিলে কিন্তু।"

বিদেশের মুখের দিকে তাকায় নবীনা। অযত্নে বেড়ে ওঠা চুল ঘাড়ে লুটোচ্ছে। মুখের দাড়ি বেড়েছে। তবু চোখের চাহনির সরলতা সবকিছুকে ছাপিয়ে চোখে পড়ছে। চোখ, ভ্রু, টানা টানা। পুরু ঠোঁটে একটা অসহায় ভাব। আরশিনগরের

না দেখা বাঁশি ধরা হাতের মুখখানি কী এরকম সহজ সুন্দর মুগ্ধকরা ছিল ? নবীনা চোখ সরিয়ে নেয়। পিসিমনি অসুস্থ। আগামীকাল থেকে স্কুল যেতে হবে। এসময়ে চাইলেও ও বিদেশকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেনা। মিথ্যে স্তোক দিয়ে লাভ কী ?

শান্তদা ডঃ দেবকে নিয়ে হাজির হলে নবীনা স্বস্তি পায়। বিদেশকে ও কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। একটু বাদেই ওরা বেরিয়ে আসে। নার্স এসে রুগীর গা মুছিয়ে পোশাক পালটে দেবে বলে পর্দা টানছে। বিদেশ খাওয়ায় মত দিয়েছে। একটু গলা ভাত আর মাছের ঝোল ওকে দেওয়া হবে বলে দেব জানান।

দেবের রুমে গিয়ে বসে ওরা। দেব বলেন, "খোলাখুলি বলি। পেশেন্টের ব্যাপারে লুকিয়ে তো কোন লাভ নেই। আমি গতকাল প্রেসার, পালস রেট দেখেছি। নরমাল। সকালে খালিপেটে ব্লাড নেওয়া হয়েছে। আবার খাওয়ার পরে নেওয়া হবে। আশা করছি সবকিছু স্বাভাবিকই থাকবে।"

"তাহলে কী ওকে আর রাখতে হবে না ?" শান্তদা দেবের কাছে জানতে চান।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দেব বলেন, "এখন বেশ কিছুদিন ওর চিকিৎসার দরকার। তবে সেটা আমার এখানে হবে না।"

"মানে ?" শান্তদা অবাক হন।

ও আশ্চর্য হয়না। যেটা বুঝেছে সেটাই মিলে গেল তাহলে ?

"ওর মানসিক চিকিৎসার দরকার। ভালোরকম ডিপ্রেসানে ভুগছে ছেলেটা। এসময়ে ওকে কোনমতেই তোদের ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবেনা।"

"তাহলে কী কোন এ্যাসাইলামে রাখতে হবে ?"

সেটা এখনই বলতে পারছি না। দেখছি। কাল আগে রিপোর্টগুলো পাই।

ওকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন শান্তদা। নামার আগে নবীনা বলল "একটা কথা বলব। আপনি এত ভাববেন না। তেমন হলে চিকিৎসার জন্য ওকে আমার বাড়িতে রাখা যাবে কদিন। এখন পিসিমনি অসুস্থ। উনি একটু সামলে নিন।"

শান্তদা তাকালেন ওর দিকে। তারপর নিচু স্বরে বললেন, "ভাবছিলাম কী করব। তুমি আমায় বাঁচালে। আজ আসি। রাত হয়েছে। কাল দেব কী বলে, তোমায় জানিয়ে দেব।"

খুব ভাল লাগছিল ওর। শান্তদাকে বিদেশের ভাবনা থেকে এখনকার মত মুক্ত করতে পেরেছে। তবে পৃথিবীতে দু'একজন এমন থাকে, যারা সবসময় অন্যকে নিয়ে ভাবছে। তাদের পুরোপুরি মুক্ত কেউ কখনও করতে পারেনা। নিজের কথা ভাবছিল নবীনা। এখনও পিসিমনি ওর গার্জেন। কিন্তু কবে থেকে যে শান্তদা ওর অভিভাবক হয়ে গেলেন কে জানে ? তবে ওইটুকুই। শান্তদা অনেকটা বাড়ির ছাদের আকাশের মত। যতটা কাছের ঠিক ততটাই দূরের।

# #

সকালে ছাদে নিজের ব্যায়ামের ম্যাট পেতে যোগব্যায়াম করছিল নবীনা। ছাদের একপাশে একটা শেড আছে। রোদ্দুর গায়ে লাগেনা। সেখানেই ব্যায়াম সারে ও। রোজ আধঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিট ও ব্যায়ামের জন্য বরাদ্দ করেছে। মোবাইল মিউট করা আছে। কাঁপুনির গোঁ গোঁ আওয়াজটা কানে যায়নি।

ফোনে পিসিমনি ডাকল ওকে। চা হয়ে যাবার পর বাড়িতে থাকলে এই ডাকটা আসে। তার মানে পিসিমনি অনেকটা ভাল হয়ে গিয়েছে। ম্যাট ভাঁজ করতে করতে গুনগুন করে কৃষ্ণের একটা ভজন গাইছিল ও। আচমকা মনে পড়ল আরশিনগরে মীরা এই ভজনটা করত। ও রাস্তায় যেতেযেতে শুনে শুনেই শিখেছে হয়ত। গানের বিষয়ে ওর নিজস্ব একটা দক্ষতা আছে। একদম ছোটতেই মায়ের শিক্ষক ব্রজদুলাল বাবুর কাছে গান শিখতে শুরু করেছিল তো। তিন চার বছর শিখেওছিল। ব্রজবাবু খুবই সুদর্শন ছিলেন। গানের গলাও ছিল চমৎকার। ও নিজেও মাষ্টারমশাইকে খুব ভালবাসত। তারপরেই ঘটে সেই ঘটনা। কাউকে কিছুই না বলে, ওই ব্রজবাবুর সঙ্গেই মা চলে গিয়েছিল একদিন।

মার চলে যাওয়াটায় ওর কষ্ট হলেও সামলে নিয়েছিল। কিন্তু বড় হয়েও ক্ষমা করতে পারেনি মাকে, একেবারেই অন্যকারণে। মা আর ব্রজবাবু শহর ছাড়ার পর ওদের বাড়ির ড্রইংরুমে এসেছিলেন রোগা, একেবারে সাধারণ চেহারার এক মহিলা। তার কোলের বাচ্চা মেয়েটাকে মাটিতে নামিয়ে বাবার কথামত সোফায় বসেছিলেন তিনি। পাশে দাঁড়িয়েছিল একটি সাত আট বছরের ছোট ছেলে। মেয়েটার আর ছেলেটার জামা কাপড়েও কেমন অভাবের ছাপ। তখন নবীনা নিজেও অনেক ছোট। তবু অবস্থার ফারাকটা ঠিকই বুঝেছিল। দরজায় দাঁড়িয়েছিল ও। শুনছিল ওদের কথাবার্তা। বড় হবার পরে ছবিটা আবছা আর কাহিনিটা স্পষ্ট হয়েছে।

ভদ্রমহিলা ব্রজবাবুর স্ত্রী। উনি বারবার বলছিলেন, "এভাবে চলে গেল ? আমাদের কথা একবার ভাবল না ? দাদা, আমি এদের নিয়ে কোথায় যাব ? বাপেরবাড়ি বলতে আমার এক ভাই আছে। সে নিজেই খুব দুঃস্থ। নিজেদেরই খাওয়া জোটেনা, আমাদের কী করে দেখবে ?"

বাবা বলেছিলেন, "এই ছোট বাচ্চাকে রেখে তো আপনি কাজে যেতে পারবেন না। আমি আপনাকে কাজ দিতে পারি। ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। হাতখরচের জন্য টাকা পাবেন। তাতেই একরকম করে চালিয়ে নেবেন। আমার রান্নার লোক আছে। গ্রাম থেকে আমার বোন আসছে, আমার মেয়েকে দেখেশুনে রাখার জন্য। এবাড়ির সব ঘর বারান্দার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখার দায়িত্বে আপাততঃ কেউ নেই। সে কাজটা আপনাকে দিতে পারি। আপনাকে পরিষ্কার করতে হবেনা, লোক দিয়ে করিয়ে নিতে হবে। তাছাড়া আমার বোনকে প্রয়োজনে সাহায্য করতে হবে।" নবীনাকে বাবা যেতে বলেন নি। ও দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ কথাবার্তাই শুনেছিল। ভদ্রমহিলা নিঃশব্দে কাঁদছিলেন।

বাবা আবার বললেন, "আমার স্ত্রী যা করেছে তার কিছুটা হলেও প্রায়শ্চিত্ত আমি করতে চাই। ভাড়াবাড়ি ছেড়ে চলে আসুন। নিচের একটা ঘর খুলে দেওয়া যাবে। ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানেই থাকবেন, খাওয়াদাওয়া এখানেই করবেন। ওদের পড়াশুনার খরচ বা যা কিছু বেঁচে থাকতে গেলে লাগে, আমিই দেব। আপনি আপনার বাপেরবাড়িতে কথা বলুন। আমার কথায় রাজি না হলে সেটাও জানিয়ে দেবেন। আর একটা কথা, কিছু টাকা দিচ্ছি। এ'মাসটা যাহোক করে চালিয়ে নিন। সামনের মাসে আমার বোন এলে আসবেন। নাহলে বাজে লোকেরা খারাপ কথা রটাবে। সেটা আমি হতে দিতে পারিনা।"

এখন ওর মনে হয় বাবা খুব বিচক্ষণ আর স্পষ্টবাদী ছিলেন। সেই সুধাপিসিমা তার ছেলেমেয়ে পিকু আর মিঠুকে নিয়ে অনেককাল তাদের বাড়িতেই কাটিয়েছেন। প্রয়োজন না থাকলে বাড়ি থেকে বেরোতেন না। অদ্ভুত আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল তার। কোনদিন তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টাও করেননি। নিপুণভাবে সব কাজ করতেন। গাছপালা ভালোবাসতেন। বাড়ির বাগানে তখন তার উৎসাহে নানা ধরণের সবজি, ফলফুল ফলত। বাবা অবশ্য তার ছেলেমেয়ের পড়াশোনার জন্য বা অন্য কিছুর জন্য যখন যা লেগেছে, বরাবর দিয়ে এসেছেন। ছেলে পিকু রেলে চাকরি পেতে আলাদা বাড়িতে উঠে যান সুধা পিসিমা। তবে প্রয়োজনে আসতেন সাহায্য করতে। বাবাকে দাদা বলে ডাকতেন। খুব ভক্তি করতেন। শেষ দিন অবধি পিসিমনির সঙ্গে উনিও বাবাকে ভাইফোঁটা দিয়েছিলেন।

মাঝে মাঝে একটা জিনিস ওকে ভাবায়। প্রেমের মত একটা আবেগ কতদূর গ্রহণযোগ্য ? নদী যেমন বন্যা এলে মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়, প্রেমও একটা সাজানো গোছানো সংসারের সব পর্দা টেনে ছিঁড়ে দিতে পারে। পিসিমনি ওকে বলেছিল একবার, "কথাটা অন্য ভাবে ভাব। যে সংসার ভাঙে তা ভেঙেই ছিল। খালি কেউ বুঝতে পারেনি। গাছের গোড়ায় উইপোকা, অথচ গাছে ভরা পাতা ফুল। এও তেমনি।"

বাবা কেন সুধা পিসিমাদের বাঁচিয়েছিলেন, তা তখন তেমনভাবে না বুঝলেও পরে বুঝেছিল ও। মায়ের পাপের বোঝা খানিক হাল্কা করতে চেয়েছিলেন হয়ত। কেউ কাউকে সত্যি সত্যি ভালবাসলে বোধহয় এমনই করে। তবে দুর্ভাগ্য এই যে ভালবাসা বড় একতরফা হয়। আর একটা ব্যাপারেও বাবাকে তখন না বুঝলেও পরে তার প্রতি শ্রদ্ধা হয়েছে। কোনদিন কারোর কাছে মায়ের চলে যাওয়া বা সুধাপিসিমাদের পরিচয় নিয়ে লুকোচুরি করেননি। গ্রাম থেকে অনেক লোকই সময়ে অসময়ে এসেছে। ওদের বাড়িতে থেকে নিজেদের কাজ মিটলে চলে গিয়েছে। কিন্তু সুধা পিসিমাদের মত কৃতজ্ঞ হতে ও কাউকেই দেখেনি। এখনও নিয়ম করে বিভিন্ন তিথিতে সুধাপিসিমা আসেন। বাবার ছবিতে মালা পরিয়ে যান। ওদের জন্য মিষ্টি আনেন। যদিও সুধা পিসিমা এলেই ওর মনখারাপ হয়। পুরনো নির্মম অতীত, হুস করে মাথার মধ্যে ভেসে ওঠে। বাবা শেষ আঘাত পেলেন ওর বিয়েতে। তাই সব মিটিয়ে ওর ফিরে আসার পরে আর বেশিদিন বাঁচলেন না।

এখন একটাই চিন্তা ওর মাথায় ঘুরছে। পিসিমনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবে। স্কুলে যাওয়া তো শুরু হয়েই গেল। কিন্তু এরপরে বিদেশকে নিয়ে ও কী করবে ? শান্তদাকে দেওয়া কথা তো ও ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তাছাড়া বিদেশকে নিয়ে আরেকটা অসুবিধা ও টের পেয়েছে। সম্প্রতি বিদেশ ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিংবা হয়ত আগেই দুর্বল ছিল, ও বুঝতে পারেনি। তবে যাই হোক এব্যাপারটাকে ও কোনমতেই প্রশয় দিতে পারবে না।

বিদেশের চাহনি ওর ভালো ঠেকছে না। গতকাল শান্তদাকে যখন ডাক্তার দেব বিদেশের মানসিক অসুস্থতার কথা বললেন, তখনই এই ব্যাপারটা ও উল্লেখ করবে ভেবেছিল। কিন্তু লজ্জায় পারেনি।

শান্তদা একবার বলেছিলেন ওকে, "মানুষের সমস্যা কী জানো, সে তবু ভয়, ঘৃণাকে অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু লজ্জাকে নয়। কথায় আছে, 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়'। আমি মানি না। কথাটার আংশিক সত্যতা আছে।"

মাঝেমাঝে ওর মনে হচ্ছে ওর বাবা, মায়ের ক্ষেত্রে লজ্জা না পেয়ে, সারাজীবন সবটা খোলাখুলি রাখার যে সাহস দেখিয়েছিলেন, তা ওকে পারতেই হবে। না বিদেশের ব্যাপারে লজ্জা পেলে ওর চিকিৎসাটা ঠিকমত হবেনা। ডক্টর দেবকে সব কথা খুলে বলতে ও বাধ্য। কিন্তু শেষ অবধি পিসিমনিকে নিয়ে সমস্যা তো থেকেই যাবে ? পিসিমনি যদি জানতে চায় "হঠাৎ এই ছেলেটিকে বাড়িতে এনে তুলছিস কেন ? আর কোন উপায় ছিল না ? কী বলবে ও ?"

স্কুলে গিয়ে টের পেল একটা থমথমে আবহাওয়া চলছে, এবং সেটা ওকে নিয়েই। নভেম্বর মাসে একই সঙ্গে দ্বাদশ ও একাদশ শ্রেণীর টেস্ট । সব টিচারকেই গার্ড দিতে হয়। বড়দি পরীক্ষা কমিটিকে বলেছেন ওকে গার্ড লিস্ট থেকে বাদ রাখতে। সেটাই বেশিরভাগের রাগের কারণ। হায়ারসেকেন্ডারী বা অন্যান্য চাকরির পরীক্ষায় স্কুলের ভেনুতে ও যদি পয়সা নিয়ে গার্ড দিতে পারে, এবারেই বা পারবে না কেন ?

বড়দি হাসছিলেন। "এরা কেমন ইলজিকাল ভাবনা চিন্তা করে দেখো। তুমি কটাকা পাও ? কোয়ালিফিকেশান তো এদের কারোর থেকে তোমার কম নয়। একটু আধটু তোমাকে ছেড়ে দিলেও এইসব ঝামেলা পাকাবে।"

ও অবশ্য হেসে বলেছিল, "না দিদি, ওরাই ঠিক বলেছে। পয়সা পেলে গার্ড দেব, আর অন্য সময় ফাঁকি দেব, তা হয়না। কমিটিকে বলুন বাকি পরীক্ষাগুলোয় আমাকে রাখতে। আমি গার্ড দেব ।তবে এবার থেকে পয়সা নিয়ে গার্ড নাও দিতে পারি। আগে থেকে জানিয়ে রাখলাম।"

বড়দি অবশ্য ওর কথায় সিদ্ধান্ত পালটে দেননি। তাই কমনরুমে ঢোকার পর, ও তেমন উষ্ণ অভ্যর্থনা পেল না। শুধু চন্দনা একটু সরে ওকে জায়গা করে দিয়ে বলল, "ফিরলি তাহলে ? বোস। হাওয়া গরম। গার্ড আছে। এসে কথা বলছি।"

পরীক্ষায় গার্ড দিয়ে ফিরে এসে অনুরাধাদি বসলেন ওর আর এক পাশে। "তারপর ? কবে ফিরলে ? তুমি তো বাইরে গিয়েছিলে, তাই না ?"

ও ব্যাগ থেকে বই বার করছিল। একদম ঠান্ডা চোখে তাকায় ওনার দিকে।

উনি সামলে নেন নিজেকে। "না, মানে সেদিন বড়দির ঘরে আমিও ছিলাম তো। ঝুমুর দাসের গার্জেন তোমার খোঁজ করতে এলে বড়দিই বললেন, তুমি বাইরে গিয়েছ। স্কুলে ছুটিতে আছ।"

"হ্যাঁ ছিলাম না।" বলে আবার বই খোলে ও।

"না মানে ঝুমুরের বাবা বলছিলেন ..."

"জানি।" ও থামিয়ে দেয় ওনাকে। "বড়দি আমাকে সব বলেছেন। আর আমি ঠিকঠাক ব্যবস্থাও নেব। আর কিছু বলবেন ?"

স্পষ্ট ইঙ্গিত। উনি তবু থামেন না। উগ্র কৌতূহলে বলেন, "ব্যবস্থা ? মানে ঝুমুরের ব্যাপারে ? সেটা কী ?"

"সেটা আমি বড়দি ছাড়া কারোর সঙ্গেই শেয়ার করতে পারব না অনুরাধাদি। আমাকে মাপ করবেন।" ও দেখে শুধু উনি নন। টেবিলের চারপাশের মুখগুলো উৎসুক হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে। তাদের দৃষ্টিও ওর কথায় একেবারেই নিভে যাচ্ছে। এবার মন দিয়ে হাতের বইটা দেখতে শুরু করে ও। আজ এই অবধি থাক। ওরা আর ওকে ঘাঁটাবেন না।

চন্দনা এলে ব্যাগ তুলে নিয়ে এগোয় ওরা। লাইব্রেরি রুমে এখন কেউ নেই। বসে কথা বলা যাবে।

ওর শাড়িটা দেখিয়ে চন্দনা চোখ নাচায়। "প্রিন্টেড শাড়ি। কিন্তু ভারি সুন্দর দেখতে রে! কোথা থেকে নিলি নাকি কেউ দিল ?"

ও অম্লান বদনে মিথ্যে বলে। "ওই পিসিমনির কান্ড ! বাড়িতে যারা বিক্রি করতে আসে, তাদের থেকেই নিয়েছিল আমার জন্য। আলমারিতেই ছিল। আজ বার করলাম।"

এবারে এনজিও থেকে সব কর্মচারীদের পুজোয় পোশাক দেওয়া হয়েছে। ওকে শাড়িটা আসলে দিয়েছেন শান্তদা। গাছপালার প্রিন্ট। মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হলুদ ফুল দুচারটে। খুব পছন্দ হয়েছে ওর। আজ স্কুল ফেরৎ নার্সিংহোমে যাবে। তাই এটাই পরে এলো।

লাইব্রেরিতেই চা নিয়ে জমিয়ে বসে ও আর চন্দনা। পরীক্ষা চলছে, ছাত্রী, শিক্ষিকারা কেউ নেই। তাই বড় বড় আলমারি বোঝাই ঘরের একপ্রান্তের চেয়ারে গুছিয়ে বসতে ওদের কোনও অসুবিধাই হয়না। সামনের টেবিল থেকে চা তুলে চুমুক দিতে দিতে, চন্দনা এটা ওটা কথা বলে। স্কুলের গোলমালের খবরটা বিশদে দেয়। বড়দি ওকে যেটা বলেননি সেটাও বলে। ওকে নিয়ে নাকি স্টাফেরা একটা ইনফর্মাল মিটিং করেছিল। তাতে চন্দনা ছাড়াও আরো দু'একজন টিচার বড়দির সিদ্ধান্তে সমর্থন জানিয়েছেন। লোকরঞ্জনের ব্যাপারেও কথা হয়েছে কমনরুমে। লোকটা একেবারেই সুবিধের নয়।

চন্দনা বলে, "আমি বলেছি ওদের, এব্যাপারে নবীনা নেই। ঝুমুরকে কোথাও পাঠালে ও আর কাউকে না জানাক আমাকে বলতই।"

নবীনা হাসে। "সে তো ঠিকই। আজ উঠি রে। একটা কাজ সেরে বাড়ি ফিরব।" চন্দনাকে মিথ্যে বলতে ওর খারাপই লাগে। কিন্তু কিছু উপায় নেই তো।

রাস্তায় পা দিয়ে ওর মনে হয়, ব্যাপার কী ? বিদেশ ওকে এত টানছে কেন ? ওর নিজেরও কি তাহলে একটা দুর্বলতা এসেছে ছেলেটার ওপর। তারপরেই ভাবনাটা উড়িয়ে দেয় ও। যদি তেমন কিছু হয় হবে। এত ভাবার কী আছে ?

নবীনা স্কুলের বড় গেট খুলে এগিয়ে যাচ্ছে তখন।

পেছন থেকে ওকে একমনে লক্ষ্য করছিল চন্দনা। "নবীনার মধ্যে হঠাৎ কেমন যেন একটা উজ্জ্বল ভাব ফুটেছে। নতুন কিছু কি ঘটল ?" কথাটা ভাবতে ভাবতে কমনরুমের দিকে এগোয় ও।

# #

(চলবে)

ঐতিহ্যময় শহর চন্দননগরের স্থায়ী বাসিন্দা **সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়** বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির স্নাতক। ১৯৯৬ সালে প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় "দিবারাত্রির কাব্য" পত্রিকায়। ২০০১ সালে "দেশ" পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। 'আনন্দবাজার', 'বর্তমান', 'আজকাল', 'প্রতিদিন', 'তথ্যকেন্দ্র', 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ছাড়াও, 'অনুষ্টুপ', 'কুঠার', এবং 'মুশায়ারা'-র মতো বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনেও তার কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশের ধারা অব্যাহত। প্রকাশিত উপন্যাস পাঁচটি, গল্পগ্রন্থ তিনটি, এবং কবিতার বই একটি।

তপনজ্যোতি মিত্র

অবারিত সৌন্দর্যের দরোজা

অবারিত সৌন্দর্যের দরোজা খুলে দেওয়ার কথা ছিল আমাদের

গভীরতম ভালোবাসার পৃথিবীতে হেঁটে যাওয়ার কথা ছিল

অমল জ্যোৎস্না ঘরে যাওয়ার কথা ছিল

সমুদ্র শব্দময় বালিয়াড়ির বালি ছুঁয়ে সারা রাত জেগে থাকার কথা ছিল

ধূসর অরণ্যের মর্মর হাহাকার শুনে স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল

একটি অমল শিশুকে ভালোবেসে,
একটি অপরূপ জ্যোৎস্নার নারীকে ভালোবেসে,
একটি নদীর স্রোতকে ভালোবেসে,
সারা জীবনের সঞ্চয়কে কুড়িয়ে নেওয়ার কথা ছিল

সেই মায়াবী পৃথিবীর কাছে সব ধার দেনা শোধ করার কথা ছিল

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি', 'অমৃতের সন্তানসন্ততি', 'ঈশ্বরকে স্পর্শ', 'মায়াবী পৃথিবীর কবিতা', 'সুধাসাগর তীরে', 'সে মহাপৃথিবী', 'আকাশকুসুমের পৃথিবী' । কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্পও করতে ভালবাসেন।

পারিজাত ব্যানার্জী

গাঁ ঘরের প্রান্তজন কথা

শুনেছি, শহরের প্রতিটি ইঁট আজ যুদ্ধরত।
আমাদের গ্রামে তো মাটির দেওয়াল, সেখানেও বুঝি পড়বেনা কোনো ক্ষত ?

আঁধার রজনী দ্বিধা ব্যাকুলতা হানে –
মাঠের ফলন মরে – দায়ের বোঝা বাড়ে প্রাণে।

নেহাৎ বউটা আধপেটা খেয়ে থাকে আমার মুখ চেয়ে রোজ –
তাই সংসারের ছিটকিনি আটকাই সামলে, চলে শুকনো জমিতে লাঙ্গল চালিয়ে খোঁজ!

ঠোঁটে ঠোঁট ঘষতেই ফোটে পদ্ম, ডুব দেয় একশালিক –
বিভাজনে ছিন্ন হৃদয়দুটো তখনও একাকার স্বপ্নবৎ অলীক !

গাঁ বধুর মনন যাতনা ব্যথা

আজ দশদিন হল ছেলেটার কোনো খোঁজ নাই।
যুদ্ধের বাদ্যি বেজেছে শুনেই নেচেছিল ওর মন, বলেছিল "পালাই পালাই"।

ওর বাবাই ওকে সীমান্ত অবধি এগিয়ে দিয়ে আসে।
হাঁপাচ্ছিল খুব ফেরার পথে, যা গরম এই ভরা ভাদ্রমাসে !

এখনও মাঝরাতে বসে পড়ে প্রায়ই – জানতে চায়, "শ্মশান কত দূর !"
বুকে তেল মালিশ করতে করতে তাই চোখের উপর পরশ মাখাই ঘনঘোর !

এই আমার এক জ্বালা – কিছুতেই ওকে সামলাতে পারিনা আমি –
ছেলের কথা নাই বা আর তুললাম – ওকে শুনেছি দেখবে "দেশ" আর না জানি কোন্ অন্তর্যামী !

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

ধারাবাহিক

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ১৫

জয়িতা উড়তে থাকা পর্দায় ঢাকা দরজাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল । আজ ভীষণ বিস্মিত হয়ে গেছে সে । বিস্ময়ের ঘোরটা এতই বেশী যে এখন তার মাথাটা যেন বুঁদ হয়ে আছে । সোম অফিস যাওয়ার পথে সে তাকে দেখতে আসবে, তা সে জানত । পাপান যে বিকেলের দিকে আসবে, সেটা পাপান আগেই ফোনে জানিয়ে দিয়েছিল । কিন্তু সোমের সঙ্গে ব্যক্তিত্বময়ী সুশ্রী যে ভদ্রমহিলা এসে সপ্রতিতভাবে ঘরে ঢুকলেন এবং ঢুকেই জয়িতার বিছানার পাশে বসে জয়িতার ডান হাত নিজের দু'হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন ভালো আছো জয়িতা ?' তাঁকে দেখেই খুব অবাক আর অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিলো সে । পরিচয়টা সোমই করিয়ে দিয়েছিলো, ''জয়িতা এ আমার বন্ধু, শিঞ্জিনি । এর কথা তো তোমাকে আগেই বলেছি'' । শুনে চমকে গিয়েছিলো জয়িতা, বুঝতেই পারেনি যে ভদ্রমহিলা হঠাৎ তার কাছে কেন । এখনও জয়িতার কাছে সেটা পরিস্কার নয়, তবে এ'কথা সে স্বীকার করতে বাধ্য যে শিঞ্জিনিদিকে তার বেশ ভালো লেগেছে । কি সুন্দর আন্তরিক ব্যবহার ! উনি নিশ্চয় জানেন যে ওনার আর সোমের বন্ধুত্বের কথা জয়িতার অজানা নয়, উনি নিশ্চয় এ ও বোঝেন যে ওনাদের বন্ধুত্বটা জয়িতার মনে কোনও বিরূপ প্রভাব ফেললেও ফেলতে পারে, তা সত্বেও কিন্তু উনি এসেছেন, শুধু অসুস্থ জয়িতাকে দেখবেন বলে । এবং শুধু আসেননি, ওনার প্রতি আচরণ উনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে কোনও কিছু জরিপ করতে নয়, শুধুমাত্র জয়িতাকে দেখবার জন্যই উনি জয়িতাকে দেখতে এসেছেন । ভালো লেগেছে জয়িতার প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে অনেক গল্প করেছে সে-ও শিঞ্জিনিদির সঙ্গে, আবার আসতে বলেছে । বেশ স্নেহময়ী একটা ভাব আছে শিঞ্জিনিদির ব্যবহারে । আরেকটা জিনিস খুব ভালো লেগেছে জয়িতার । যতই বন্ধুত্ব থাক, শিঞ্জিনিদি কিন্তু সোমের সঙ্গে বেশী কথা বলেননি, যেটুকু বলেছেন স্বাভাবিক বন্ধুত্বের স্বরেই বলেছেন । নয়তো পুরো সময়টিই দিয়েছেন জয়িতাকে । সোম বরং বারেবারে কথা বলবার চেষ্টা করছিলো শিঞ্জিনিদির সঙ্গে কথা বলবার । সোমের চোখে মুখে মাঝে-মাঝেই একটা মুগ্ধতা ফুটে উঠছিলো সোমের যে মুগ্ধ দৃষ্টিটা জয়িতার কাছে এখন অন্য আরও অনেক কিছুর মতোই অতীত হয়ে গেছে । কিন্তু শিঞ্জিনিদিকে খুব ভালো লেগেছে তার মোবাইল নম্বর আদান প্রদান করেছে, আবার আসতে বলেছে এখানেও তাদের ফ্ল্যাটেও ।

উড়তে থাকা পর্দাটা মৃদু মৃদু দুলছে এখন । সেদিকে তাকিয়ে ভারী অন্যমনস্ক হয়ে গেলো জয়িতা । মনের মধ্যে কোথাও কোনও একটা অস্বস্তি পাক দিয়ে উঠছে, তবে জয়িতা তার উৎসটা খুঁজে পেলনা । আসলে, সোমের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কোথাও যেন বেশ আলগা হয়ে গেছে । এমন নয় যে তারা দুজনে দুজনকে ভালোবাসেনা, ভালোবাসে, বেশ ভালোবাসে, কিন্তু সে ভালোবাসা প্রকাশের মধ্যে মুগ্ধতা যতটা কমে এসেছে, ঠিক ততটাই বেড়ে গেছে যান্ত্রিকতা । কোথাও যেন একটা আরোপিত ভাব অনুভব করে জয়িতা আজকাল । আসলে, ভালোবাসার বিকাশের একটা ভিত্তি থাকতে হয়, কোনও একটা কমন ইন্টারেস্ট । তার আর সোমের সম্পর্কের মধ্যে পাপান ছাড়া কোনও কমন ইন্টারেস্ট নেই, এমন বিষয়, যে বিষয়ে তারা দুজনেই সমধর্মে আগ্রহ বোধ করে, তেমন কিছু নেই বললেই চলে । এমন কি নিছক বেড়াতে যাওয়াটা বা একটা ডে-আউট ও তারা একই মানসিকতা নিয়ে করতে পারে না । জয়িতা ভেবে দেখেছে, এতে সোম বা তার, কারও নির্দিষ্ট করে কোনও দোষ নেই এর একমাত্র কারণ দুজনের মানসিকতার তফাৎ । তাই ভালোবাসাটাও যেন দানা বাঁধতে গিয়েও বাঁধতে পারেনি তাদের দুজনের মধ্যে । যেটা মূলত কাজ করে এখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে তা হল মনের আর দায়িত্ববোধ । এই অসুস্থতার জেরে বাপের বাড়িতে থাকতে এসে এ নিয়ে ভাববার অনেক অবকাশ পেয়েছে জয়িতা । সে অনেক ভেবেছে, নিজেকে নিয়ে, নিজের সংসার নিয়ে । বুঝেছে কোথাও তলে-তলে সোমের থেকে দূরে চলে গেছে সে । শপিং রেস্তোঁরায় খাওয়া, বিলাসে মোড়া জীবন — এ'সব দুহাতে আঁকড়াতে আঁকড়াতে সোমের হাত ছিটকে গেছে তার হাত থেকে । সত্যি কথা বলতে কি, এ'সব ভাবতে বসে ভয়ে জয়িতার বুক কেঁপে উঠেছে । এক অদ্ভুত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছে সে । জয়িতার

মনে হয়েছে সব চাকচিক্যের আড়ালে তার আসলটাই যেন কোথাও হারিয়ে গেছে। জাগতিকতার যে পৃথিবীতে বাস করতে সে শুরু করেছিলো, সেখানে আঁতিপাতি করে খুঁজেও সোমকে কোথাও খুঁজে পায়নি সে এই অবকাশে। সে বুঝতে পেরেছে, একটা একঘেয়েমি, একটা হতাশা তাকে দীর্ঘদিন ধরে ঘিরে ফেলেছিলো। সে যত শপিং রেস্তোঁরায়, ডুবেছে, ভেবেছে বেঁচে যাবে, হতাশা ভেতরে ভেতরে তাকে ততই পেড়ে ফেলেছে। কোথাও তাকে একটু অস্বাভাবিক করে দিয়েছে।

কেন সেদিন হঠাৎ নাচতে গিয়েছিলো সে ? মনের আনন্দে ? মনের আনন্দ কেউ নিজের অসুস্থতা ডেকে আনে ? না, জয়িতাকে নাচতে বাধ্য করেছিলো তার একাকীত্ব তার ভিতরে ভিতরে হতাশ হয়ে যাওয়া জীবন। সে যে করেই হোক একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। সোম কিন্তু ঠিকই বুঝেছিলো, তাই প্রশ্নগুলো করেছিলো। হারিয়ে ফেলেছে, কোথাও গিয়ে জয়িতা অনেকটাই নিজের দোষে, নিজের চিন্তা শক্তির সংকীর্ণতার দোষে পায়ের তলার জমিটা হারিয়ে ফেলেছে। সোম দূরের মানুষ হয়ে গেছে তার কাছে। সোমের কোনও ভালোলাগায় সে সঙ্গিনী নয় আর, সোমের কাছে সে নিছকই দৈনন্দিন জীবনযাপন। শিঞ্জিনিদির সঙ্গে সোমের সম্পর্ক গড়ে ওঠাটা এরই ফসল বুঝেছে সে। এ'কথা ঠিক যে শিঞ্জিনিদি খুব ভালো একথা ঠিক যে শিঞ্জিনিদি তাকে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে গেছে যে জয়িতার শিঞ্জিনিদি কে নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কিন্তু একথাও ঠিক সত্যি যে এ'সব কিছু সত্বেও জয়িতা সোমকে অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। সোম এখন তার কম অন্যের বেশি। সোমের যে অংশটা তার ভাগে পড়েছে, সেটা নিয়েই চলতে হবে তাকে বাকি জীবন, কারণ বাকি অংশটার থেকে সোম যেচে তাকে বঞ্চিত করেনি, জয়িতাই অবহেলায় তাকে সরিয়ে রেখেছিলো সে অংশটা তার জীবন থেকে, আজ শত চেষ্টাতেও আর তার দখল পাওয়া মুশকিল। ওটা অন্য কারও ভাগে পড়ুক নাই পড়ুক, জয়িতার কাছে আর তা কোন দিন ফিরে আসবে না। ওই দুলতে থাকা পর্দাটার মতোই কেবল দূর থেকেই দেখতে থাকবে জয়িতার আকুলতাকে। জয়িতা হেরে গেছে, সব জিতেও কোথাও একটা জয়িতা একদম হেরে গেছে।

মোরে আসা বিকেলটায় দুড়মুড় করে হঠাৎ একগাদা রঙ এসে গেলো। এতক্ষণ যেন বড় বেশী নিস্তেজ আর নির্বিকল্প হয়ে বয়ে যাচ্ছিলো গোধূলি, এক নিমেষেই চঞ্চল পাখির মতো ডানা মেলে এখন যেন উড়ে বেড়াতে লাগল দিগন্ত থেকে দিগন্তে। পাপানের অন্ততঃ তাই মনে হল। সকাল থেকেই পাপানের চোখ দুটো যা দেখবার জন্য উন্মুখ হয়েছিলো, সারাটা দিন এক অসহ্য ছটফটানি সহ্য করেছিলো, তা এখন এসে দাঁড়িয়েছে স্কুল থেকে বেরিয়েই পশ্চিমদিকে দশ পা হেঁটে গেলে যে রাস্তার মোড়টা পরে, ওখানে। পাপান জানত, সকাল থেকেই পাপানের মন বলছিলো যে আজ ইমন এসে দাঁড়াবে, ইমনের সঙ্গে আজ দেখা হবে। স্কুল থেকে বেরিয়েই পাপানের উৎসুক চোখ খুঁজে নিয়েছিলো ইমনকে, গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা চেহারাটা। এক দৃষ্টে তাদের স্কুলের দিকের রাস্তাটা দেখছে ইমন। পাপানদের স্কুলের গেট আর ঐ রাস্তার মোড়টার একটা আশ্চর্য্য সমীকরণ আছে। এমনিতে দু'জন মানুষ এই দুদিকে দাঁড়িয়ে থাকলে পরস্পরকে দেখতে পাওয়ার কথা। কিন্তু মাঝের রাস্তাটার ভৌগলিক অবস্থান এমনই যে, একজন মানুষ যদি স্কুলের গেট থেকে বেরিয়ে রাস্তার একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে দাঁড়ায়, তাহলে সে মোড়ের মাথার মানুষটিকে দেখতে পাবে, কিন্তু নিজে থেকে যাবে সে মানুষটির দৃষ্টির অগোচরে। রোজ বিকেলে ইমনের উপস্থিতি টের পাওয়ার জন্য এই অবস্থানটা একপ্রকার আবিস্কারই করে ফেলেছে পাপান বলতে গেলে। এই মুহূর্তেও সেই বিশেষ সুবিধাজনক জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছে পাপান। উফ্ ! আজ দারুণ লাগছে ইমনকে। স্কুলের সাদা শার্টটা একটু এলোমেলো ভাবে বেরিয়ে এসেছে প্যান্টের ভিতর থেকে, মাথার চুলগুলো যেমন-তেমন ভাবে পড়ে আছে কপালের উপর, এত দূর থেকেও পাতলা ফ্রেমের ওপাশের চোখ দুটোর উজ্জ্বলতা টের পাওয়া যাচ্ছে। ইমনের পাশে পাশে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলো পাপান। রোজ এই সময়টায় কোনও কথা বলেনা তারা, শুধু পাশাপাশি হেঁটে যায়। বয়সোচিত উচ্ছাস আর জড়তা দুয়েরই রেশ কাটতে সময় নেয়। ইমনকে খুব ভালো লাগে পাপানের, কত কথাই যে ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা করে ইমনের দিকে। কিন্তু কোথা থেকে যেন একটা লজ্জা, একটা সংকোচ প্রাথমিক জড়তা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় পাপানের। পাপান শত ইচ্ছাতেও এই সময়টায় ইমনের চোখে চোখ রাখতে পারেনা। এই মুহূর্তেই যেমন পাপান টের পাচ্ছে ইমন নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে তার দিকে, পাপান জানে বড় গভীরে সে তাকানো, সামুদ্রিক ঝড় ডাকা সে দৃষ্টিপাতে সাড়া দিতে গিয়েও পারেনা পাপান, মনে হয় যেন ভেসে যাবে, ভেসে যাবে সে নিছক খড় কুটোর মত সে ঝড়ে।

— ''তিস্তা, আজ বসবে একটু ?'' পার্কটার সামনে দাঁড়িয়ে ইমন নম্র প্রশ্নটা করে।

''একটু'', তিরতির কাঁপতে থাকা চোখের পাতাগুলোকে সামলাতে সামলাতে পাপান উত্তরটা দেয়।

ঘাসের উপর পাশাপাশি বসেছে তারা। এখন পার্কটা একটু ফাঁকা, পাপান জানে আর আধঘন্টার মধ্যেই প্রচুর মানুষের ভিড় হবে এখানে, তারা একটু ফাঁকা দেখেই বসেছে। ঘাসের উপর পেতে রাখা পাপানের বাঁ হাতের আঙুলগুলোর উপরে যাতায়াত করছে ইমনের ডান হাতের তর্জনী। ইমনের ডান কাঁধ মাঝে মাঝেই স্পর্শ করে যাচ্ছে পাপানের বাঁ কাঁধ। বাহুতে বাহুতে চকিৎ স্পর্শে যাতায়াত করছে কথারা। যতটা সময় একসঙ্গে থাকে, এ'ভাবেই কথা চলে তাদের। শব্দহীন এক অনুভূতি বিনিময়, একটা Communication চলতে থাকে দুজনের মধ্যে। আজ দাড়ি কেটেছে ইমন। দু-তিন অন্তর দাড়ি কাটে ও, যেদিন কাটে সেদিনটায় পাপানের খুব ভালো লাগে, হালকা একটা আফটার শেভের গন্ধ আসতে থাকে আসতে থাকে ইমনের গাল থেকে।

আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখে হেসে ফেললো শীর্ষ। নাঃ শীর্ষচন্দরকে ঠিক মতো সাজলে-গুজলে এখনও মন্দ দেখায় না, ভদ্দরলোক বাপের ব্যাটা বলেই মনে হয় এখনও। শুধু গাল-টাল গুলো বেশ ঢুকে গেছে আর চোখটা ! চোখটা আজও জ্বলজ্বল করে বটে কিন্তু যেন একটা অন্ধকার গুহার ভিতর থেকে। আসলে, মাল খাওয়াটা এত বেড়ে গেছে না ? শীর্ষভাবে যে আর অত খাবে না। কিন্তু কি করবে ? যা টেনশন ! না খেয়ে পারে না। তবে দোষ বলতে এই একটাই, আর কোনও দোষ নেই শীর্ষর। কোনও হারামি বলুক যে সে রুমকিকে ফেলে কখনও অন্য কোনও মেয়েছেলের কাছে গেছে। রুমকিকে সে ভালোবাসে। খুবই ভালোবাসে। রুমকিও তাকে, মিথ্যা বলতে নেই, খুবই ভালোবাসে। তবে রুমকির একটা চাপা অভিমান আছে তার উপর, বোঝে শীর্ষ। রুমকির বোধহয় মনে মনে আশা ছিল যে আস্তে আস্তে শীর্ষ সরে আসবে এ'সব থেকে। এটা রুমকির আন-সান ধারণা। এই চক্করে ঢুকলে আবার ওইভাবে বেরোনো যায় না কি। যতদিন আছে, সেফ্ আছে, বেরোতে গেলেই খতম। কত ওস্তাদ মালকে পাওয়ার থেকে হড়কাতেই শালা এই পৃথিবী থেকেই হড়কে যেতে দেখল শীর্ষ। সেই যে ভানুদার সঙ্গে একবার মুম্বাই গেল ইব্রাহিম ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে, ফেরবার সময় ইব্রাহিম ভাই পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলো তার, বলেছিলো, ''বেটা, লাগকে রহেনা, তু কর সাকেগা। ভুল কে ভি কভি ছোড়না মত। পাওয়ার বোলতা হ্যায় বেটা''। শেষের কথাটা শীর্ষর খুব মনে ধরেছিলো, ''পাওয়ার বোলতা হ্যায়''। কাজেই রুমকির কথা অত শুনলে চলবে না। সে তো আর শালা ওই খচ্চরের ডিম বাপটু নয় যে ঘরে নতুন বউ থাকতেও হপ্তায় তিনদিন সোনাগাছি দৌড়চ্ছে। বাপটুর কথাটা মাথায় আসতে দুম করে মাথাটা আগুন হয়ে গেল। বড্ড বাড় বেড়েছে বাপটুটা। সেদিন নাকি ভানুদার কাছে এসেছিলো। এলাকা ভাগ করতে চেয়েছে। বলেছে যে ভানুদার জমানা নাকি শেষ আর শীর্ষ তো বাঁধাধরা সেকেন্ড ম্যান। কাজেই জমানা এখন বাপটুর। সে নাকি ইচ্ছা করলেই পুরো দখলটা নিয়ে নিভৃত পারে, নেহাৎ ভানুদা এককালে তার গুরু ছিলো, তাই এলাকা ভাগের প্রস্তাবটা নিয়ে এসেছে। শুনে টগবগ করে ফুটে উঠেছিলো শীর্ষর রক্ত। রামুয়া, বিশুরা আরও বলেছিলো যে শুয়োরটা নাকি রীতিমত র‍্যালা নিয়ে কথা বলছিলো ভানুদার সঙ্গে। শীর্ষ ভানুদাকে বলেছিলো তাকে পারমিশনটা একবার দিতে, তাহলে ও হারামির নাড়ি ভুঁড়িটা টেনে বার করে দিয়ে আসে। আরে, শীর্ষ কি এমনি এমনি সেকেন্ড ম্যান হয়ে আছে নাকি ? সে কি তার হিসসা বুঝে নিতে পারত না এতদিনে ? কিন্তু একে বলে গুরুদক্ষিণা। এ'সব বুঝতে গেলে রক্তে একটু সলিড মাল থাকতে হয়। ওই বাপটুটার মতো বেজন্মা রক্ত থাকলে এ'সব বোঝা যায়না। ভানুদা দেয়নি পারমিশনটা। একটুখানি হেসে বলেছিলো, ''ছাড় তো !'' কিন্তু বাপটুটা ঝামেলা পাকিয়েই যাচ্ছে। দু'দিন আগে সন্ধ্যাবেলায় ফালতু ফালতু ঝামেলা পাকিয়ে রামুয়াটাকে খুব কেলিয়েছে বাপটুর ছেলেরা। বাপটুও নাকি সেখানে ছিলো। আবার বলেছে ''ভানুদাকে বলিস, ওকে আর ওর ওই পোষা কুত্তা শীর্ষকে যেদিন ধরব, তোর মতো আধকেলান কেলিয়ে ছাড়বো না কিন্তু, একদম শেষ করে দেবো''। শুয়োরের বাচ্ছা ! দু'দিনের লপচপানিতে নিজেকে শের ভাবছে। দাঁড়া, পুজোটা আসতে দে। এবার এমন পুজো করব না, দেখবি শালা পাওয়ার কাকে বলে, তোর সব গ্যাস ফুস করে দেবো — মনে মনে কথাগুলো আওড়ালো শীর্ষ।

সত্যিই, পুজোটা এবার বড় করে করতে হবে। পাবলিকের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে শীর্ষ। তাই না এত সাজগোজ করে

নীলদার বাড়ি যাচ্ছে শীর্ষ। নীলদা সেই যে কার্ডটা দিয়ে গিয়েছিলো, সেটা দেখে শীর্ষ পরশু ফোন করেছিলো। নীলদা আজ সন্ধ্যায় যেতে বলেছে। শীর্ষ ঠিক করেছে যে সোজা গিয়ে নীলদাকে ধরবে যাতে নীলদা একটা মোটা টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে পারে। এত বড় চাকরি করে, নিশ্চয় এ'টুকু পারবে। নীলদা লোকটা তো খুব ভালো। এই তো ফোন করতে শীর্ষর সঙ্গে কি সুন্দর করে কথা বলল। নীলদা কি জানেনা না কি যে শীর্ষ এখন কি মাল। ও লেভেলের লোকেরা সব খবর রাখে। তবু শীর্ষর সঙ্গে এত ভালো করে কথা বলে, শীর্ষর ভালো লাগে সেটা। পরশু রাতে কথা বলবার পরে, সত্যি বলতে কি, শীর্ষর মনে হচ্ছিলো যে ইস, সে ও তো ভদ্রবাড়ির ছেলে। ইচ্ছা করলে হয়তো সেও নীলদার মতো কোনও কিছু একটা হতে পারত। এখন আর হয়না ? এমনটাও ভেবেছিলো সে। তারপর নিজেই হেসে ফেলেছিলো। ভ্যাট শালা ! সে যে পাঁকে ডুবেছে, সেখান থেকে এখন আর . . . । ভাবতে গিয়ে এখন আবার হেসে ফেললো শীর্ষ। ''কি গো ? তখন থেকে হাসছো কেন ?'', পিছন থেকে রুমকির গলা, হাতে শীর্ষর মোবাইলটা, ''এই দ্যাখো ভানুদা ফোন করেছেন, কি বলছেন শোনো। মোবাইলটা কানে ঠেকাতেই ভানুদার গলা ভেসে এলো, ''এ্যাই। ঠিক আধঘন্টা পরে রুমকিকে নিয়ে ব্লু মুনে চলে আয়''। শীর্ষ হকচকিয়ে যায় , 'কেন বস ?'' জানতে চায় সে।

— ''আরে, আজ আমার আর তোর বৌদির বিয়ের দিন রে ব্যাটা। তোর বৌদির ইচ্ছে হয়েছে তোকে আর রুমকিকে পার্টি দেবে। চুপচাপ চলে আসবি আর হ্যাঁ, কোনও গিফট্ -টিফট্ আনবিনা আনলে খাবি কানের গোড়ায় একটা''।

— ''ও হো, হো ! তাই নাকি ? জিও গুরু। অভিনন্দন। কিন্তু ভানুদা, একটু রাতের দিকে এলে চলত না ?'' শীর্ষর কথা শেষ হতে না হতেই ভানুদার খিস্তি ভেসে আসে,'' কেন রে শুয়ার ? তুই কোন খাটা পায়খানার ফিতে কাটতে যাবি ? ভাও খাচ্ছিস হারামজাদা ?''

শীর্ষ হেসে ফেলে, ''আরে না না কি যে বলো। আসলে সন্ধ্যায় একজনের কাছে যাবো বলে রেখেছিলাম ''।

— ''সে পরে যাস একটু। রাত্তিরে হবে না রে। তোর বউদির ভাই বোনেরা সব আসবে তখন। তোরটা আগে সারতে হবে, ইস্‌সোশাল ট্রিট। বুঝিসই তো, সলিড কম, জল বেশী''।

— ''ওকে দাদা, ওকে, চলে আসছি, ঠিক আধ ঘন্টায় ব্লু মুন ''।

ফোন রেখে রুমকির দিকে ফেরে শীর্ষ, ''চলো, রেডি হও। ভানুদার বিয়ের দিন, তোমার আমার নেমন্তন্ন ''

ব্লু মুন জায়গাটা চাম্পুস। কেমন একটা নীল নীল আলো জ্বলে। টেবিলগুলো শালা এমন করে গোল গোল আর পিচ্ছিল বানিয়েছে যে আলো পড়ে হড়কে যায়। কেমন একটা পুকুরঘাট পুকুরঘাট ভাব।মালিক ছেলেটাও বেশ ভালো। শীর্ষ, ভানুদার ওজন বোঝে। ওরা গেলেই দৌড়ে এসে এঁটো হাসি হাসতে হাসতে কোণের একটা টেবিলে কেমন জায়গা করে দেয় যেন, শালা দেশের প্রধানমন্ত্রী আর রাষ্ট্রপতি একসঙ্গে ডিনারে এসেছে। আজও দরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁদিকের টেবিলটায় বসতে দিয়েছে ছেলেটা। অন্যান্যদিন ডানদিকের কোনটায় বসে শীর্ষরা, ওখানে বসলে স্পষ্ট দেখা যায় ব্লু মুনে কে আসছে বেরোচ্ছে। ভানুদা শালা আজ বহুত মাঞ্জা মেরে এসেছে। ডিপ্ নীল রঙের একটা পাঞ্জাবী পরে আছে সাদা পাজামার উপর, বৌদিও খুব গয়না-টয়না পরে এসেছে। আর ঝিনচ্যাক সেজে এসেছে রুমকি। আজ ব্লু মুনে একদম ভীড় নেই। যে দু'চারটে ছেলে-ছোকরা বসে মাল টানছে, সে সব শালাদের চোখ থেকে তিন নম্বর পা যে রুমকিকে দেখে টাটিয়ে যাচ্ছে, শীর্ষ বুঝতেই পারছে। শালা শীর্ষরই যাচ্ছে। আজ বাড়ি গিয়ে রাতে রুমকিটাকে আচ্ছাসে চটকাতে হবে, গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতে ভাবলো শীর্ষ। ভানুদার মেজাজটা আজ খুব তোফা আছে। হাত পা নেড়ে বৌদি আর রুমকিকে কি সব বোঝাচ্ছে। শীর্ষর খোপরিতে ও'সব ঢুকছেনা। নীলদার ফেসটা ঘুরছে খালি। নাঃ মাল ফাল খেয়ে হিসি পেয়ে গেল। শীর্ষ উঠে টয়লেটে ঢুকে গেল। আর ঠিক তখনই, তীব্র গতিতে কতকগুলো বাইক এসে দাঁড়ানোর আওয়াজ পেলো শীর্ষ। তারপরই দুপদাপ কতকগুলো পায়ের শব্দ, ব্লু মুনে ঢোকবার কাঠের সিঁড়িটা ভেঙে চুরে দিয়ে যেন ভিতরে ঢুকে আসছে। শীর্ষর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সক্রিয় হল। টয়লেটের দরজা ঠেলে বেরোতে গিয়েই চমকে গেল শীর্ষ। চারটে ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে হলঘরটার ভিতর। সবকটার গায়ে টাইট গেঞ্জি

আর জিনস্ মুখ রুমালে বাঁধা। কোনও কথা নেই, পকেট থেকে রিভলভার বের করে ফটাফট গুলি চালাতে শুরু করে দিলো ভানুদার দিকে। প্রথম পড়ল রুমকি, তারপর বৌদি, ভানুদা পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছিলো, বোধহয় মেশিনটা বার করতে, মাথায় ঠেকিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল একটা ছেলে। সমস্ত ঘটনাই অত্যন্ত দ্রুত ঘটে গেল। শীর্ষর মাথা কাজ করছিলো না, সে টয়লেটের আধখানা দরজার এপারটায় স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ মাথার ভিতর একটা ঝাঁকুনি লাগতেই শীর্ষর সম্বিত ফিরে এল। তিনজনকে শেষ করে ছেলেগুলো আরেকজন কাউকে খুঁজছে এখন। দৃষ্টি চারিয়ে দিচ্ছে এদিক-ওদিক শীর্ষ বুঝল, হারামিগুলো তাকেই খুঁজছে। কারণ গুলি চলতেই ব্লু মুনে বসে থাকা অন্য দু-চারটে পাবলিক সবই হাওয়া হয়ে গেছে। এরা বাপটুর লোক। বাপটু শালা এমন একটা কিছু করবে, বোঝেনি শীর্ষ। একবার ভাবল মেশিনটা বের করে সেও চালিয়ে দেয় গুলি ক'টা। তারপরই হাত গুটিয়ে নিল সে। নাঃ ভয়ে নয়, কেমন যেন একটা হচ্ছে তার ভিতরে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়বার আগে সে টের পেল ছেলেগুলো তাকে দেখতে না পেয়ে চলে যাচ্ছে। শীর্ষ ঐভাবেই বসে রইল কিছুক্ষণ। বাইরে থেকে আস্তে আস্তে একটা গুনগুন শব্দ আসছে, মানে লোক জমতে শুরু করেছে বাইরে। শীর্ষ নিজেকে কোনওমতে টেনে টেনে নিয়ে এল রুমকিদের কাছে। তিনজনই সাবাড় হয়ে গেছে। রক্তে ভেসে গেছে রুমকি। একটা বুলেট রুমকির বুকের ঠিক বাঁদিক বরাবর ঢুকে গেছে। আবছা চোখে শীর্ষ টের পেল কিছু মানুষ ঢুকছে ঘরের ভিতর। শীর্ষ থপ করে বসে পড়ল আর ঠিক তখনই তীব্র বেজে উঠল তার মোবাইলটা। নীলদা। ''কি রে শীর্ষ ? আসবি বলেছিলি যে ? এলিনা ?'' নীলদার গলাটা কানে আসতেই কেন জানেনা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল শীর্ষ বাচ্ছা ছেলের মতো, ''নীলদা, সব শেষ হয়ে গেছে। আমার আর কিছু নেই, আর কিচ্ছু নেই''।

একটা চমৎকার রোদ এসে পড়েছে টেবিলটার উপরে। নীল আলতো আঙুল ছোঁয়ালো রোদ্দুরটার উপরে। আজ অনেক ভোরে ঘুমটা ভেঙে গেছে। জয়িতা নেই, পাপানকে নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে। সেই জন্যই কি তাড়াতাড়ি ভেঙে গেল ঘুমটা নিজের থেকে ? অন্যান্য দিন তো জয়িতাই ডেকে দেয় তাকে। যেচে ওঠবার তাগিদটা থাকে না। আজ জয়িতা নেই, তাই তাগিদটা কি আপনা থেকেই সৃষ্টি হল ? মানুষের মস্তিষ্ক এক আশ্চর্য কারখানা, বিশ্বের সবচেয়ে জটিল সয়ংক্রীয় মেশিন নিরন্তর চলতে থাকে ওখানে।

ঘুম ভেঙেই কিন্তু মেজাজটা শরিফ হয়ে গিয়েছিলো নীলের। আকাশে চাপ-চাপ মেঘ, গভীর দুঃখে ভোরের আকাশের বুক যেন এখনই ফেটে পড়তে চায়। একটা অপার্থিব নীলচে-বেগুনী রঙ ঢেকে রেখেছিলো গোটা আকাশ। নীল চোখ-মুখ ধুতে ধুতে দিনের প্রথম সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলো যে সে আজ অফিস যাবেনা, লিখবে। অনেকদিন একটানা লেখেনি সে, আজ লিখবে। নীলের খুব ইচ্ছা যে সে একটা উপন্যাস লিখবে। কিন্তু কিছুতেই সাহস করে উঠতে পারেনা। উপন্যাস তো আর অত সহজসাধ্য নয়। সে এক বিশাল মৌচাকের মতো, অজস্র তার ব্রহ্ম, অজস্র আবেগের সেখানে অনবরত অনায়াস যাতায়াত। সেখানে পরতে পরতে ঘটনা দের খুলে যাওয়া, আবার সময় বুঝে গুটিয়ে নেওয়া। উপন্যাস তো রামধনুর মতো, তাতে বিভিন্ন রঙ ঠিকমতো মিলমিশ খেলে তবেই তো সেই রঙের ছটা উপলব্ধি করে তৃপ্ত পাঠক মন। নীল কি পারবে এমনটা ? আজ সকাল থেকে অনেকটা লিখেছে নীল। মাথা তোলবার অবকাশ পায়নি। আজ অনেকদিন পরে নিজেকে নিজের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে যেন প্রোথিত করে দিয়েছে সে। একটানা লিখে উঠে চোখ তুলতেই টেবিলের উপর এসে বসা আদুরে রোদটার সঙ্গে নীলের দেখা হয়ে গেল। রোদ্দুরটাকে কিছুক্ষণ আদর করবার পরে নীল এতক্ষণ যা লিখেছে, তা পড়তে বসল। ভালোই হয়েছে লেখাটা। লেখাটা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছে যেখান থেকে বড় গল্প কিংবা উপন্যাস-দু'দিকেই চলে যেতে পারে। নীলের মনে হল লেখাটা যেন একদম কোনও মধ্যবয়স্ক সৃষ্টিশীল সংসারী মানুষের মতো। মধ্যবয়সে এসে দাঁড়িয়ে এমন সব মানুষের সামনেই দুটো পথ খোলা থাকে। একটা পথ সংসারে আরও নিমজ্জিত হয়ে থাকবার পথ, বাজারের থলেতে, টিভির সিরিয়ালে আর ছোটো খাটো জাগতিক লক্ষ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়ার পথ, আরেকটা পথ মুক্তির পথ। সব কিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুতেই না থাকার পথ। সে পথে চলতে পারাটা উপন্যাসের মতোই। নতুন নতুন দিক জীবনে খুলে যায়, পরিশীলিত জীবন দর্শন উঠে এসে সে পথে চলা মানুষের হাত ধরে, তার বন্ধু হয়। না হলে মানুষের জীবন বড় গল্পের মতোই আর একটু এগিয়ে শেষ হয়ে যায়।

হঠাৎ করে শ্রী'কে মনে পড়ছে খুব। কি করছে ও এখন ? ব্যস্ত ? একটা ফোন করে গল্প করতে ইচ্ছা করছে খুব। নীল হাতে মোবাইলটা তুলে নিয়ে নম্বরটা টিপল। ভালো লাগছে ভাবতে, এই সুন্দর সকালে শ্রী'র গলা শোনা যাবে। ধরছে না তো ? সাইলেন্ট মোডে আছে নাকি ? আরেকটা নম্বর আছে শ্রী'র। নীল সেটায় চেষ্টা করতে লাগল। উহুঁ, এটাও ধরছে না। নীলের মনে পড়ে গেল শ্রী ওর একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়েছিলো, তাতে শ্রী'র বাড়ির ল্যান্ড লাইন নম্বরটা আছে। দ্রুত হাতে কার্ড হোল্ডার থেকে কার্ডটা বের করল নীল। কি আশ্চর্য ! এটাও কেউ ধরছে না। এবার একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল সে। একটা ফোনও ধরছে না কেন ? বাড়িতে থাকলে মোবাইল সাইলেন্ট মোডে থাকতে পারে, কিন্তু ল্যান্ডলাইন ধরছে না কেন ? আর যদি বাড়ির বাইরে থাকে, তবে মোবাইল সাইলেন্ট মোডে রাখবার মানুষ শ্রী নয়।

আধঘন্টা পরে আবার ফোনগুলোতে চেষ্টা করতে লাগল নীল। নাঃ একটাও ধরছে না। অসুস্থ নয় তো ? শ্রী'র বর আর ছেলে তো সাত সকালে বেরিয়ে যায়, তারপর হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে। শ্রী'র ভাবনাটা ক্রমশঃ অস্থির করে দিতে লাগল নীলকে। ঠিকানাটা তো কার্ডেই আছে। তাহলে নীল কি একবার চলে যাবে ? কিন্তু গিয়ে যদি দেখা যায় শ্রী'র বাড়িতে ওর পরিবারের লোকজন রয়েছে ? তাহলে নীল নিজেও অস্বস্তিতে পড়বে, শ্রীকেও ফেলবে। আরও একবার নম্বরগুলো ডায়াল করল নীল। নাঃ, লাভ হলনা। নীল মনস্থির করে ফেলল। যে যাই ভাবুক — যাই ঘটুক, সে শ্রী'র বাড়ি যাবে। দেখা দরকার কি হল। এভাবে বসে থাকলে সারাদিন সে শান্তি পাবে না। শ্রী'র কাছে যাওয়ার দুর্বর একটা ইচ্ছা তাকে ঠেলে বের দিলো ফ্ল্যাটের বাইরে। গাড়িটা নিলনা নীল, একটা ট্যাক্সি ধরে রওনা দিল শ্রী'র বাড়ির দিকে। উঁচু বহুতলটার দিকে তাকিয়ে নীল ভাবলো, এরই পাঁচতলায় দশ নম্বর ফ্ল্যাটটিতে এখন যেতে হবে তাকে। গেলে কি হবে, গিয়ে কি হবে — এই মুহূর্তে এ'সব চিন্তা করতে চাইলোনা নীল। শ্রী'কে একবার চোখের দেখাটা খুব জরুরী এখন তার কাছে।

ফ্ল্যাটের দরজার বাঁদিকে লাগানো বেলটায় হাত দিতে যেতেই নীলের মোবাইলটা বেজে উঠল। শ্রী ! তাড়াতাড়ি ফোনটা কানে নিল সে।

— '' তুমি ফোন করেছিলে নীল ?'' খুব ক্লান্ত স্বরে শ্রীর গলাটা ভেসে এলো।

— ''আমি তোমার ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে শ্রী'', নীল সব ছেড়ে আগে এই খবরটা দিলো। শ্রী'র দরজায় পৌঁছে আর শ্রী'র গলা শুনে অনেকটা হালকা বোধ করছে নীল।

''ও মা ! তাই নাকি ! দরজা খোলা আছে, ভিতরে চলে এসো''।

শ্রী'র স্বর বলছে যে সে অসুস্থ। অসুস্থ মানুষের গলার স্বর, চোখের দৃষ্টি অসুস্থতার বার্তা বহন করে, অনেক সময় সে মানুষের অজান্তেই।

দরজা ঠেলে ঢুকতেই বিশাল এক লিভিং রুম। খুব সুন্দর করে সাজানো-গোছানো বুঝতে পারলেও, নীলের এখন এ'সব দেখবার বেশী আগ্রহ নেই। সে যথাসম্ভব দ্রুত শ্রী'র কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে।

লিভিং রুমের ডানদিকে একটা বড় ঘর। পর্দাটা আলগা করে দরজার অর্ধেক অবধি টানা। ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল নীল। একটা বড় সাদা চাদরে মোড়া বিছানায় শুয়ে আছে শ্রী। পরনে একটা দুধসাদা নাইটি। সেই নাইটির উপরের দিকে জেগে আছে সাদা পায়রার মতো নরম তুলতুলে শ্রী'র দুই স্তন, যেন দিনভর আকাশ পরিক্রমার শেষে পায়রা দুটি আশ্রয় নিয়েছে তাদের নিরাপদ বাসাটিতে। শ্রী'র মাথার চুল টান টান করে পিছন দিকে বাঁধা, কিছু আলগা চুল অবাধ্য ছেলের মতো দৌরাত্ম করছে শ্রী'র ছোট কপালে। শ্রী'র ওষ্ঠ যেন একটু স্ফুরিত, যেন কিছুটা অনর্থক অভিমান সঞ্চিত করে রেখেছে সে কোনও প্রগাঢ় চুম্বনে তা উজাড় করে দেবে বলে, শাঁখের মতো দুহাতে ভর দিয়ে উঠে বসতে চাইলো শ্রী পারলোনা। দেখেই মনে হচ্ছে, শ্রী বেশ অসুস্থ। নীলের কিন্তু অসুস্থ শ্রী'কেও দেখতে বেশ লাগলো। সাদা পোশাকে, অগোছালো দেহ বিন্যাসে শ্রী'কে সরস্বতী ঠাকুরের মতো লাগছে। আস্তে আস্তে শ্রী'র বিছানার পাশে বসলো নীল। কপালে আলতো হাত ছোঁয়াতেই চমকে যেতে হল। ধূম জ্বর।

— ''এ কি ? তোমার তো খুব জ্বর শ্রী। ঔষধ খেয়েছো ? নীল উদ্বিগ্ন হয়ে গেলো।

— ''দুর ! আমার জ্বর হয়না। এমনি গা টা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে।''

— ''বাজে বোকোনা। তোমার এখনই ঔষধ খাওয়া দরকার'' বলতে বলতেই পাশের নিচু টেবিলে চোখ পড়তে অবাক হয়ে গেল নীল, ''এই তো এখানে প্যারাসিটামল রয়েছে দেখছি। খাওনি ? ঈষৎ হেসে ফেলে শ্রী, ''খাওয়া আর হল কোথায় ? না গো নীল আসলে ঔষধ খেতে আমার একটুও ভালো লাগে না ''।

— ''তা বলে তো হয়না'' বলতে বলতে কিছুটা জোর করেই নীল শ্রীকে ঔষধ টা খাইয়ে দেয়।

প্রায় ঘন্টাখানেক হয়ে গেল, শ্রী'র কাছে এসেছে নীল। ঔষধটা খাওনোর পরে অবসন্ন শ্রী'র মাথায়, কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলো সে। তাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে এক তরফা জ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাওয়া শ্রী। এখন শ্রী অল্প অল্প নড়ছে। জ্বরটা ঘাম দিয়ে ছেড়ে গেছে কিছুক্ষণ হল। এই মুহূর্তে শ্রী'র চিবুকে, চোখের নিচে, কপালে, গলা আর বুকের সন্ধিস্থলে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। চোখ বুজে শুয়ে থাকা শ্রী'কে বড় আকর্ষনীয়া মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে। নীল ভাবল, সরস্বতী ঠাকুরকে কি চুমু খাওয়া যায় ? যত্ন করে ঠোঁটে তুলে নেওয়া যায় তার চিবুকের ঘাম ? নীল তার ঠোঁট নামিয়ে আনল শ্রী'র চিবুকে। খুব যত্ন করে, যেন সমুদ্রের কোল থেকে সংগ্রহ করছে দুস্প্রাপ্য ঝিনুক, সে'রকম ভঙ্গিতে আলতো করে ঠোঁটে তুলে নিলো চিবুকের ঘাম। তারপর বড় মুগ্ধ ভঙ্গিতে সে তার ঠোঁট শুষে নিতে লাগল শ্রী'র কপালের ঘাম। নীলের মনে হলো শ্রী যেন এক অভিশপ্তা রাজকন্যা, সে রাজপুত্রের মতো চুম্বন করলেই জেগে উঠবে রাজকন্যা, কেটে যাবে যাবতীয় অভিশাপ। শ্রী চোখ খুলেছে এবার। নীলের আদর টের পেয়েছে সে, তবু চাঞ্চল্যহীন হয়ে রয়েছে শ্রী যেন এমন আদর খেলেই সব অসুখ সেরে যাবে বলে জানা আছে তার। শ্রী একদৃষ্টে দেখছে নীলকে। শ্রী'র চোখে যেন গভীর এক প্রশ্রয়। নীল এবার শ্রী'র পদ্মফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁট দুটো তুলে নিলো তার ঠোঁটে, ডুবিয়ে দিলো অতল আহ্বানে। নীলের ঠোঁট এখন শ্রী'র ঠোঁট দুটোকে মুখের মধ্যে নিয়ে খেলা করে চলছে অনবরত। দুজনের জিভ ছুঁয়ে যাচ্ছে পরস্পরের জিভের ডগা থেকে মধ্যভাগ।

— শ্রী, শ্রী, আমার শ্রী ! আর যে পারিনা আমি।'' হাহাকারের ভঙ্গিতে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে করতে শ্রী'র স্তনে মুখ গুঁজে দেয় নীল। শিশুর আগ্রহে সে অস্বাভাবিক দ্রুততায় নেড়ে চেড়ে দেখতে থাকে শ্বেতশুভ্র সে মায়াপ্রসাদ, যেন কি এক খোঁজে সে ডুবে যেতে চায় ঐ কোমলতায়। শিঞ্জিনি-ও তার ডান হাত দিয়ে আরও নিবিড় করে টেনে নেয় নীলের মুখ নিজের বুকে। নীল আলতো টানে খুলে ফেলে শৃংখল, পাগলের মতো, সদ্যোজাত শিশুর মতো, সন্ন্যাসীর মতো, ভিক্ষুকের মতো, সম্রাটের মতো সে যাতায়াত করতে থাকে শ্রী'র চুল থেকে স্তনের উপত্যকায়। হঠাৎ দু'হাতে শ্রী'কে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকের উপর টেনে নেয় নীল। থরথর করে কাঁপতে থাকে দুটি দেহ। যেন অনাদিকাল থেকে সঞ্চিত লাভা আজ পরিত্রাণের পথ পেয়েছে, যেন রুদ্ধ আবেগ কি এক মুক্তির আনন্দে আজ বেহিসাবী, বেসামাল, যেন আদিম যুগ থেকে উঠে এসেছে প্রাকৃতিক দুই নর-নারী যেন সংস্কার, সভ্যতা, সমাজ, নিয়ম কানুন — সব কিছু নিমেষে আজ অনর্থক হয়ে উঠেছে। আর সব কিছু মুছে গেছে বিশ্ব চরাচর থেকে, জাগতিক পৃথিবীর যাবতীয় কৃত্রিমতা খসে পড়ছে দুড়মুড় করে, কেবল একটি সত্য, একটি ঋদ্ধ মন্ত্রই উচ্চারিত হচ্ছে সব আরাধনাকে নিমিত্ত মাত্র করে — ভালোবাসা, ভালোবাসা, ভালোবাসা। এ' পৃথিবীর সব বেড়া, সব শৃংখলকে অবহেলায় দূরে সরিয়ে ক্রমেই এক হয়ে যেতে লাগল দুটি দেহ, ক্রমেই দুটি মন মগ্নতার চূড়ান্তে পৌঁছে যেতে লাগল অনাবিল আবেশে।

পাপান এবার উঠেই পড়ল। বাপি ডেকে দিয়ে গেছে মিনিট পাঁচেক হল। মা মামারবাড়ি যাওয়ার পর থেকে এ'কদিন বাপিই তার ভোরবেলাকার গার্জেন। বাপি তো এমনিতে কোনওদিনই সংসারের কোনও ব্যাপারে তেমন থাকে না মা-ই সামলায় সব। কিন্তু মা শরীর খারাপের জন্য মামারবাড়িতে গিয়ে থাকবার পর থেকে বাপি কিন্তু ভালোই সামলাচ্ছে পুরো ব্যাপারটা।

মা'টা একদম পাগল। কেন যে অমন করতে গেলো ? সেদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে পাপান তো অবাক হয়ে গিয়েছিলো। মা খাটে বসে আছে, দু'হাতে ভর দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝোঁকা, জিভটা কিছুটা বেরিয়ে এসেছে, প্রচন্ড

হাঁফাচ্ছে। পাপান দৌড়ে গিয়ে ইনহেলারটা নিয়ে এসে মা'র মুখে ঢুকিয়ে পাম্প করে দিয়েছিলো তারপরেই ডাক্তারকাকুকে একটা ফোন করেই বাপিকেও খবরটা দিয়েছিলো। মা'র হাঁফ হওয়াটা নতুন কথা কিছু নয়, সে তো মাঝে-মাঝেই হয়, এবারের কারণটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলো সবাই। মা'ই একটু ধাতস্থ হতে বলেছিলো কারণটা। সেদিন পাপানের স্কুল থেকে ফিরে মা নাকি খুব নেচেছিলো। একটা সময় মা নাকি নাচ শিখেছিলো। সেদিন দুপুরে খুব ইচ্ছা হয়েছিলো, তাই অনেকক্ষণ নেচেছিলো মা। তারপরে হাঁফ হতে শুয়ে পড়ে। বিকেলের দিকে শরীরটা একটু ভালো লাগতেই নাকি আরেক দফা নাচতে ইচ্ছা করেছিলো মা'র। আবার নাচ শুরু করেছিলো সে, কিন্তু শরীর নেয়নি। দ্রুত দ্বিগুণ বেগে ফিরে এসেছিলো শ্বাসকষ্টতা। কষ্ট হবে জেনেও মা আবার কেন নাচতে গিয়েছিলো, পাপান বোঝেনি। বাপি বুঝেছিলো কিনা, কে জানে ! খুব চুপ করে গিয়েছিলো বাপি। রাত্রিবেলা খালি মা-র বিছানার পাশে বসে মা'র হাতটা নিজের দু'হাতে তুলে নিয়েছিলো বাপি, খুব শান্ত গলায় জানতে চেয়েছিলো, ''কেন এটা করলে জয়িতা ? কি করতে চাইছিলে তুমি ? কেন ?'' কোনও উত্তর দেয়নি মা। শুধু একটু ম্লান হেসে মুখটা নামিয়ে নিয়েছিলো।

ডাক্তারকাকু বলেই গিয়েছিলেন যে হার্টের উপর খুব চাপ পড়েছে, হাঁফটাও মারাত্মক বেড়েছে, মা'র একদম শুয়ে বিশ্রাম নেওয়াটা খুব জরুরী। কিন্তু এই ফ্ল্যাটে কে দেখবে মা কে সারাদিন ? সে, স্কুলে যায়, বাপি অফিসে, দাদানের শরীর খারাপ তাই দিদান এসে থাকতে পারবেনা। তখন ঠিক হল, মা দিদানের কাছে গিয়ে ক'দিন থাকবে। মা'র আপত্তি ছিলো, বোধহয় ভাবছিলো তার আর বাপির অসুবিধা হয়ে যাবে। কিন্তু বাপি কোনও কথা শোনেনি, জোর করেই মা'কে পাঠিয়ে দিয়েছিলো মামারবাড়ি।

বিছানা ছেড়ে উঠে ব্যালকনির দরজায় এসে দাঁড়ালো পাপান। একটা ডেক চেয়ারে চুপ করে বসে আছে বাপি। হালকা ছাই রঙের একটা ট্র্যাকস্যুট পরে আছে, মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলো একটু ঘেঁটে আছে, অনেক দূরে দৃষ্টি ভাসিয়ে তাকিয়ে আছে বাপি। তাঁর বাপি যেন একটু অন্যরকম মানুষ, বোঝে পাপান। সবেতেই আছে, কিন্তু তবু যেন কোথাও নিজেকে একটু আলাদা করে নিতে পারে। অনেকবার পাপান দেখেছে , কোনও পার্টি বা জমায়েতে খুব হইচই করতে করতে হঠাৎ একদম চুপ করে যায় লোকটা। পাপানের মনে হয় কোথাও যেন বাপি খুব একা। আরেকটা কথাও পাপান বোঝে। হতে পারে মা'কে খুব ভালোবাসে সে, কিন্তু বাপিকে যেন পাপান একটু বেশীই ভালোবাসে। একটু হলেও একটু বেশী। পাপান নিঃশব্দে নীলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, মেয়েকে হঠাৎ খেয়াল করতে পেরে নীল একটু হাসল শুধু, তারপর আবার দৃষ্টি ভাসিয়ে দিলো দূরের সবুজের দিকে। একটু পরে নিঃস্তব্ধতা টা ভাঙল নীলই।

— ''দ্যাখ পাপান সামনে সবুজ গাছগুলোকে। দূরের সবুজ মাঠটাকে। চারদিকে এত ইঁট, কাঠ, কংক্রিটের মধ্যেও কেমন দ্বিধাহীন মাথা তুলে আছে''।

— ''হ্যাঁ, মানুষের মনের ইচ্ছার মতো'', পাপানের অপ্রত্যাশিত উত্তরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ঘোরায় নীল।

— ''মানে, আমি যেটা বলতে চাইছি, তা হল যে মানুষের জীবনটা তো কেজো রুটিনে ভর্তি, তারই মধ্যে তবু মানুষের মনে সবুজ ইচ্ছা তো মাথা তুলে থাকেই সব রুটিনের বাইরে।

— ''বাঃ ! তুই তো খুব সুন্দর করে ভাবতে পারিস রে পাপান,'' নীল খুশী হয় মেয়ের উপর, মনে হয় যে মেয়েটা তার বড় হয়ে গেছে, ভাবতে শিখে গেছে, ভালো লাগে নীলের। আলতো করে মেয়ের হাত ধরে পাশের চেয়ারে বসায়, তারপর বলতে শুরু করে, ''জানিস, পাপান মা, এই যে তুই একটা সুন্দর ভাবনা ভাবতে পারলি, এর দাম অনেক। হতে পারে, আমাদের আশপাশের পৃথিবীটায় এর তেমন কোনও মূল্য নেই, তবু এর মূল্য অসীম। সুন্দর করে ভাবতে পারাটা মানুষের মনে প্রতিমুহূর্তে অতিরিক্ত অক্সিজেন যোগায়। আসলে, সুন্দর মন থাকাটা মানুষের জীবনে যে কত প্রয়োজনীয়, তা বেশীরভাগ মানুষই বোঝেনা। মনের গুরুত্ব দিতে আজও ভালোভাবে শেখেনি মানুষ। শিখলে বুঝতে পারত, একটা সুন্দর মনের অধিকারী হতে পারলে বাকি জীবনটাও কত সহজ হয়ে আসে।''

— ''কি ভাবে বাপি ?'', পাপান বুঝতে চেষ্টা করে।

— ''দ্যাখ, একটা মানুষ যদি তার মনটাকে সুন্দর রাখতে পারে, চিন্তাটাকে স্বচ্ছ রাখতে পারে, তার ভেতরের যে সে-টা তোকে প্রাকৃতিক রাখতে পারে, তবে জীবনের প্রতি তার যে দৃষ্টিভঙ্গি আর দর্শন, তা আপনা থেকেই বড়মাপের হয়ে ওঠে। জীবনকে দেখবার নজরটাই পাল্টে যায়। এই যে ধর মানুষ কথায়-কথায় বলে যে সে ভালোবাসে, সত্যিকারের ভালোবাসতে জানে ক'জন ? বেশীরভাগের কাছেই তো ভালবাসা মানে পাওয়া, অথচ ভালোবাসা মানে তো পাওয়া নয়, দেওয়া, নিঃশর্তে দিতে পারাটাই তো ভালোবাসা। ভালোবাসা তো অনন্ত, তাকে কি কোনও নিয়ম বা বেড়ায় বাঁধা যায় ?''

— ''বাপি, তুমি মা'কে খুব ভালোবাসো তাই না ?'' পাপান নীলের উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয়। আসলে, সে এখন এই আলোচনাটা চালতে চাইছে। এই আলোচনার সুত্র ধরে সে তার একটা দ্বিধার উত্তর খুঁজতে চাইছে।

পাপানের প্রশ্নটা শুনে নীল চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। যেন প্রশ্নটার তার জানা, কিন্তু কিভাবে শুরু করবে, সেই পথটা ভাবছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে নীলের উত্তরটা ভেসে আসে, যেন একটু দূর থেকেই, ''হ্যাঁ, বাসি। তোর মা'কে আমি তার মতো করে আমি যথেষ্টই ভালোবাসি''।

নীলের উত্তরটা বোধগম্য হয় না পাপানের। বাপি মা'কে মার মতো করে ভালোবাসে — কথাটার মানে কি ? কাউকে কারও মতো করে আবার ভালোবাসা যায় না কি ? মানুষ তো নিজের মতো করেই অন্যকে ভালোবাসবে।

নীল বোধহয় ধরতে পেরে যায় মেয়ের মনের ধন্দটা। একটু হাসে পাপানের দিকে চেয়ে। তারপর হালকা চালে বলে ওঠে, ''কি রে, কথাগুলো একটু ভারী ভারী হয়ে যাচ্ছে নারে ?'' —

— ''না, বাপি, তুমি বলো, আমি শুনবো'' — পাপান আলোচনাটা চায়।

— ''তাহলে এক মিনিট দাঁড়া। মোবাইলটা বাজছে, ঝামেলাটা মিটিয়ে দিয়ে আসি''। মোবাইলের ডাকে দ্রুত সাড়া দিয়ে আবার ব্যালকনিতে এসে বসে নীল, ''আসলে কি জানিস পাপান মা ভালোবাসা ব্যাপারটাই অনন্ত, অসীম এবং তার নির্দিষ্ট কোনও আকার নেই, নেই পরিমাপও। তুই হিসাব করে বলতে পারিসনা যে তোর মধ্যে অন্যকে দেওয়ার জন্য এতটা, ভালোবাসা আছে। যদি তাই হত, তাহলে মানুষ একই সঙ্গে এত মানুষকে ভালোবাসে কি করে ? আসলে মানুষের হৃদয়ে তার ভালোবাসার মানুষদের জন্য আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠ তৈরী হয়ে যায়। এখন, ভালোবাসা যেহেতু অনন্ত, তাই এই প্রকোষ্ঠের সংখ্যাও অনন্ত। যতজন মানুষকে ইচ্ছা ভালোবাসতে পারিস তুই, কাউকে বঞ্চিত না করেও। এখন প্রশ্ন হল, আলাদা-আলাদা প্রকোষ্ঠের প্রয়োজনটা কেন ? তার কারণ হল, সবাইকে তো একরকম ভাবে ভালোবাসা যাবে না। প্রত্যেককে তার মতো করে ভালোবাসতে হবে। তোর ভালোবাসার মানুষদের প্রত্যেকের সঙ্গে তোর সম্পর্কের সমীকরণটা আলাদা, তোর দিতে চাওয়া ইচ্ছাটা আলাদা, তাদের নেওয়ার আর চাওয়ার ধরণটা আলাদা। কাজেই তুই যদি সবাইকে একই ধরণে ভালোবাসা দিতে চাস, তবে বিড়ম্বনাই বেড়ে যাবে খালি, তুই ঠিকমতো communicate করতে পারবি না তোর ভালোবাসাটা। পুরো ব্যাপারটা দুর্বোধ্য হয়ে গিয়ে ভুল বোঝাবুঝি বাড়িয়ে দেবে। After all, এই প্রতিটি মানুষের নিজস্ব একটা entity আছে, এবং নিজস্ব দর্শন ও দাবীও।''

পাপান হাঁ করে শুনে যাচ্ছিলো। বাপি কে আজ তার অন্য কেউ বলে মনে হচ্ছিলো। এ'কথা ঠিক যে বাপি একটু অন্যরকম মানুষ, কিন্তু বাপি যে কত গভীরভাবে ভাবতে পারে, সে ধারণা পুরোপুরি তার ছিলোনা। আজ যেন বাপি মনের সব ভাবনা উজাড় করে দিচ্ছে তার সামনে। নীল মেয়ের মুখ দেখে হেসে ফেলে, ''কি রে, চুপ মেরে গেলি যে ?''

''আচ্ছা বাপি,'' পাপান সামলে নিয়েছে নিজেকে কিছুটা,'' তুমি তাহলে মা ছাড়া আরও কাউকে ভালোবাসতে পারো ?'' একটু চুপ করে যায় নীল। কি জানতে চাইছে পাপান ? পাপান কি কিছু আন্দাজ করে ? নাঃ শ্রী'র সমন্ধে কিছু জানাটা পাপানের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কি জয়িতা আর তার মানসিক দূরত্ব আন্দাজ করতে পেরেছে পাপান ? নাকি পুরোটাই বয়সোচিত কৌতূহল।

''পারি,'' সামান্য উত্তরে প্রসঙ্গটা শেষ করে আলোচনার মোড়টা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয় নীল, ''হ্যাঁরে পাপান, তুই কি ভালোবাসিস কাউকে ?''

চকিতে পাপানের মুখে একরাশ রক্ত খেলে যায়, ব্যাপারটা নজর এড়ায়না নীলের । স্বাভাবিক, এ বয়সে স্বাভাবিক । একটা আলগা ভালো লাগা তৈরী হতেই পারে এ'বয়স থেকে আগামী কয়েক বছর গুলোতে । এ'গুলো টেঁকেনা, টিকে যায়, থেকে যায় ভালোবাসাই । নীলের মনে কোথাও কিন্তু সুপর্ণা বসবাস করে থাকতে পারেনি, কিন্তু শ্রী থেকে গিয়েছিলো । এই তফাৎটা করতে শেখা দরকার মানুষের ।

''দ্যাখ পাপান, ভালোবাসাটা মোটেই দোষের কিছু নয় । কাউকে ভালোবাসছিস বলে কোনওদিন অপরাধ বোধে ভুগবিনা । শুধু তোর দৃষ্টিভঙ্গিতে ভালোবাসার মানুষটিকে বিচার করে নিস একবার সে তো ভালোবাসার যোগ্য কিনা । জানিস তো ভালোবেসে যেমন নিজেকে মেলে ধরতে হয়, তেমন গুটিয়ে নিতেও জানতে হয় । তবে হ্যাঁ, যদি সত্যিই কাউকে উপযুক্ত বলে মনে হয়, তবে তা জানাতে দ্বিধা বা দেরী করিস না । সামান্য দেরীর মাশুল কখনও ভয়ানক হয়ে ওঠে'', শেষের দিকটা নীলের গলা অন্যরকম শোনায় । পাপান কোনও উত্তর দেয় না । শুধু চেয়ারটা কাছে টেনে নিয়ে নীলের হাতে মাথা রাখে বাচ্ছা মেয়ের মতো । সুন্দর সকালটায় চুপ করে বসে থাকে দুজন বাবা আর মেয়ে ।

নীল পাপানের ফেলে রেখে যাওয়া চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ । তার পাশে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কি মনে পড়াতে উঠে গেছে মেয়েটা । নীলের দৃষ্টি ধীরে ধীরে সরে এল সামনের বেতের গোল টেবিলটার উপর রাখা তার লেখার খাতাটায় । ভোরের হাওয়ায় অল্প অল্প উড়ছে পাতাটা । ফর ফর শব্দ হচ্ছে পাতাগুলোর বুক থেকে । ঐ পাতাগুলোর বুকেই সে তৈরী করতে চেষ্টা করছে তার জীবনের প্রথম উপন্যাসের বাসভূমি । শ্রী চেয়েছে, তাই এতবড় একটা কাজে হাত দিয়েছে সে । শ্রী চাইলে সে সব পারে । এই প্রৌঢ় বয়সে তার জীবনের মানেটাই বদলে দিয়েছে শ্রী । বহুবছর বাদে নীল এখন আবার নতুনভাবে বাঁচতে পারছেও । সোমদত্ত সেন হয়ে যেতে যেতে কোথায় যেন নীল সেন হারিয়ে যাচ্ছিলো ক্রমশঃ । আসলে, নীল নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছিলো । প্রতিষ্ঠা বস্তুবাদীতা আর জাগতিক সাফল্যের আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে ডুবেই গিয়েছিলো নীলের আসলটা । ডুবে গিয়েছিলো নাকি নীল নিজের স্বেচ্ছায় ডুবিয়ে দিয়েছিলো ? বোধহয় দ্বিতীয়টাই ঠিক । আসলে একটা বয়সে পৌঁছে, যে বয়সে মানুষের এতকাল দেখে চলা স্বপ্ন আর বাস্তবের ঠোকাঠুকি লাগাটা শুরু হয়, নীল বুঝেছিলো যে স্বপ্নগুলো তার নিজস্ব হয়ে রইলেও, নীল আর নিজস্ব হয়ে থাকতে পারছেনা । সে খুব দ্রুত অন্য সবার হয়ে যাচ্ছে । অফিস বসের বিশ্বস্ত জুনিয়ার, পরে অফিসের কর্মদক্ষ সিনিয়ার ম্যানেজার, মা'র ছেলে, জয়িতার স্বামী, পাপানের বাবা, সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষ — ক্রমশঃ এ'সব পরিচয়গুলোই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এবং এই ভীড়ে ক্রমাগতঃ একলা হয়ে পড়ছে কবিতা লেখা, স্বপ্ন দেখা, ভাবালু মনের নীল । সোমদত্ত সেনের চারপাশে অনেক মানুষ ছিলো, আরও জুটে যেতে দেরী হয় নি, নীলের ত্রিসীমানায় মানুষের সংখ্যা খুব দ্রুত কমে এসেছিলো । বাধ্য হয়ে নীল যেন সমঝোতা করেছিলো সোমদত্ত সেনের সঙ্গে, সোমদত্তকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে নীল চলে গিয়েছিলো ঘূর্ণিপাকের অন্তরালে । শুধু যখন একেকটা দিন আসত যেদিন হঠাৎ একটা সুন্দর কবিতা লিখে ফেলত হিসাব কষতে থাকা ডানহাত, যখন অফিসের জানলা দিয়ে গোধূলি চোখে পড়লে হু হু করে এক দমকায় পিছন দিকে ছুটে যেত সময়, যখন কোনও কোনও রাতে হঠাৎ ইচ্ছে করে উঠত আকাশের কথা কান পেতে শোনবার, বীরভূমের লালমাটি আর কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ো টেনে নামাতে চাইত সযত্নে পরে থাকা মুখোশ, মন্ত্রসিদ্ধের মতো এইসব মুহূর্তে জেগে উঠত নীল, যে নীল তার নিজস্ব, যে নীল আর কারও নয়, যে নীল তার দৃষ্টি বিস্তৃত করে দ্বিতীয় কোন ও নীরাকে খোঁজে কোনও দিক্ শূন্যপুরে ।

খাতাটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল নীল । কি লিখে চলেছে সে দিনের পর দিন ? কি তার বক্তব্য ? কিই বা তার উপন্যাসের উপজীব্য ? আপন মনে লিখতে লিখতে যখন হুঁশ ফেরে, কালির অক্ষরে গড়ে তোলা শব্দের মৌচাকটাকে নেড়ে চেড়ে দেখে নীল, মাঝে মাঝে মনে হয় তারই ছায়া ভেসে বেড়াচ্ছে এ'লেখার পর্বে পর্বে । নীল ভাবে, ক্ষতি কি ? প্রতিটি মানুষের জীবনই তো আদতে একটা উপন্যাসের মতো । তার পরতে পরতে বিস্ময়, তার বাঁকে বাঁকে ঘটনার ঘটঘটা । মানুষের জীবনে যা ব্যক্তিগত ভাবে ঘটে চলে, লেখকের কলমে তাই-ই তো সচ্চার হয়ে ওঠে । লেখকের মনে ছাপ ফেলে

যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা, অঘটনা, অনুভূতিদের দেখে, উপলব্ধি করে পাঠকের মনে হয় এ'বুঝি তার নিজেরই কথা। পাঠক তখন নিজের মনের ঝাড়বাতিটা জ্বেলে দেখতে থাকে ঘটনাগুলো আপন ভাবনার আঙিনায়। আসলে, লেখকের বোধ আর অনুভূতি বৃষ্টির মতো। ঠিক ভাবে তা পাঠকের মননে ঝরে পড়তে পারলেই পাঠকের চেতনা রামধনু ফুটে ওঠে। লিখে যাবে, লিখে যাবে নীল, একদম নিজের মতো করে, নিজের চেতনা, বোধ, বিশ্বাস আর অনুভূতিতে ভর দিয়ে তাতেই আপন দ্যুতিতে ভাস্বর হয়ে উঠবে তার সৃষ্টি, ছুঁয়ে নেবে প্রার্থিত করতল, কাম্য হৃদয়।

— ''বাপি, তুমি কি মাকে সকালে দেখতে যাবে ? নাকি বিকেলে যাবে গো ?'', ডাইনিং রুমের ওদিকটা থেকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় পাপান।

নিজস্ব চিন্তায় ডুবে থাকা নীল হঠাৎ থতমত খেয়ে যায় পাপানের প্রশ্নটায়। সত্যিই তো, সে ঘুম থেকে উঠেছে প্রায় ঘন্টা দেড়েক হলো। কই, এখনও তো একবারের জন্য জয়িতাকে ভাবেনি সে। নিজের ভাবনা নিয়েই সে আছে আজ সকাল থেকে। আসলে, একটা কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য নীল যে জয়িতা তার স্ত্রী বটে, কিন্তু সহধর্মী হয়ে উঠতে পারেনি কোনও দিন। না, জয়িতাকে সে কোন দোষ দেয়না এরজন্য। প্রতিটি মানুষের মানসিক গঠন, জীবন দর্শন তো আর সমান হয়না। নীল সেটা জানে। তবু মানুষ তো চায় যে তার সঙ্গে জীবন কাটাতে থাকা মানুষটি তাকে বুঝুক, ভাগ করে নিক তার অনুভূতি, ভালো লাগা। এই কাজটি বোধহয় কোনওদিনই সে আর জয়িতা ভালোভাবে করে উঠতে পারেনি। একটা চিন্তার তফাৎ, যাকে ওয়েভ লেংথের পার্থক্য বলে, সেটা চিরকালই ছিলো তাদের দুজনের মধ্যে। সেও এগিয়ে যায়নি, জয়িতাও এগিয়ে আসেনি, তাতেই তৈরী হয়ে গেছে আজকের মধ্যে ফাঁকটা। এই ফাঁকটা এতই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো সোমদত্ত সেনের যে এটা গায়েই মাখতনা সে। কিন্তু নতুন করে জেগে ওঠা নীলের চোখে বড় স্পষ্ট করে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে এই তারতম্যটা আর সেটা বোধহয় আজকের নীলের আচরণেও জেনে বা না জেনে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। জয়িতাও বোধহয় কোথাও একটা টের পেয়েছে যে মাঝের ফাঁকটা একটু বেশী ই বড় হয়ে গেছে। তাতেই কি জয়িতার মনে বেশীই বড় হয়ে গেছে। তাতেই কি জয়িতার মনে সৃষ্টি হয়েছে কোনও চাপা অভিমান ? নাকি জয়িতা কোথাও একটা নিরাপত্তা অভাবে ভুগতে শুরু করেছে ? না হলে জেনে বুঝে, কষ্ট হচ্ছে অনুভব করেও জয়িতা অমন নেচে চলবে কেন ? জয়িতাকে শ্রী'র গল্প করেছে নীল, ধারে-ধারে ইঙ্গিত দিয়েছে যে শ্রী তার খুব ভালো একজন বন্ধু। না, জয়িতার মনে শ্রী কে নিয়ে কোনও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে এ'কথা বলছেনা নীল। জয়িতা অত গায়েই মাখেনা ও'সব। জয়িতা বড় মনের মেয়ে, ওকে খুব ভালোমত চেনে নীল। জয়িতার আসল সমস্যা হল ওর একাকীত্ব যা জয়িতা নিজেই নিজের জীবনে ডেকে এনেছে।

মোবাইলটা বেজে উঠতে হাতে নিয়ে অবাক হয়ে গেলো নীল, ভালোও লাগল তার। শ্রী। শ্রী তো এই সময়ে ফোন করেনা। ফোনটা কানে হ্যালো বলতেই ভেসে এলো শ্রী'র প্রশ্নটা, ''নীল, তুমি আজ জয়িতাকে কখন দেখতে যাবে ?''

প্রশ্নটায় অবাক হয়ে গেলেও উত্তরটা দিয়ে দেয় নীল, ''এই তো সকালে, অফিস যাওয়ার সময়''।

— ''তোমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে একটু ঘুরলেই তো আমার ফ্ল্যাট। আমাকে একটু তুলে নেবে প্লিজ ? আমি জয়িতাকে দেখতে যাবো নীল''। নীলের বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে যায়। শ্রী জয়িতাকে দেখতে যাবে ? কেন ?

— ''নীল, অবাক হয়োনা। আমার জয়িতাকে দেখতে যাওয়া উচিৎ। আমায় নিয়ে যেও'' নীলের বিস্ময়টা উপলব্ধি করেই যেন আরেকবার নিজের উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট করে শিঞ্জিনি।

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী — পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

শকুন্তলা চৌধুরী

পরবাসী

পর্ব ৯

(১৩)

প্রায় একবছর হতে চললো।

লাপ্পা মারা গিয়েছিলো ওর জন্মদিনের ঠিক দেড়মাস পড়ে।

আবার ঘুরে এলো লাপ্পাহীন লাপ্পার জন্মদিন।

ছবিতে মালা, আটটা candle, ধূপ আর দম-আটকানো এক নীরবতার মাঝে শুচি-সুশোভন।

কথাও নেই, হাসিও নেই, গানও নেই, চোখের জলও নেই।

পার্টি, গল্প-গুজব তো নেই-ই – শুচি আর সুশোভন আবার ঢুকে গেছে নিজেদের গণ্ডীতে। কোথাও যায় না।

অসীম-রুমা এবং অন্যান্য বন্ধুরা অনেকবার ডেকেছে, তারপর চুপ হয়ে গেছে।

কিছুটা guilty-ও feel করে বোধহয় অসীম-রুমারা – ওরা লাপ্পাকে সুরক্ষিত রাখতে পারেনি।

যদিও সুশোভন বারবার অসীমকে বলেছে যে accident-এর ওপর কারোর হাত নেই, তবুও। .....

সম্পর্কগুলো আর স্বাভাবিক হলো না।

আসলে কিছুই যে আর আগের মতো নেই !

শুচি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে প্রায় ছ'মাস হলো।

চেষ্টা করেছিলো চালিয়ে যেতে, পারলো না।

মন দিতে পারতো না কিছুতেই।

মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেতো – কথা শুনতে পেতো না।

বাড়ী এসেও চুপ করে বসে থাকতো।

কখনো খেতো, কখনো খেতো না।

মাঝে মাঝে রান্না করতো, মাঝে মাঝে ভুলে যেতো।

সুশোভন কখনো রান্না করতো, কখনো কিছু কিনে আনতো।

সেও আর আগের মতো নিয়ম মেনে সব করতে পারছিলো না, দোকানেও নিয়মিত যাওয়া হচ্ছিলো না।

এইভাবে কিছুদিন চলার পর, সুশোভন শুচির সঙ্গে মুখোমুখি বসলো একদিন।

বললো – "শুচি, তুমি এইরকম করলে কিকরে চলবে ? .... বাঁচতে হবে তো !"

শুচি শূন্য চোখে তাকিয়ে বললো – "বাঁচতে কি হবেই, সুশোভন ? .... জীবনের ভার যে আর টেনে চলতে পারছি না !"

সুশোভন খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো – "জন্ম বা মৃত্যু কোনোটাই তো আমাদের হাতে নেই, তাই যতদিন না মৃত্যু আসে ততদিন তো বাঁচতে হবেই।"

শুচি বললো – "তুমি আমাকে কি করতে বলো ?"

সুশোভন বললো – "তুমি আমার সঙ্গে ডঃ জনসনের অফিসে চলো। তোমার মনের কথা সব খুলে বলো ওনাকে – দুঃখ, হতাশা সব। দেখো উনি কি বলেন।"

প্রাণহীন গলায় শুচি বললো – "ঠিক আছে, যাবো।"

শুচির ডিপ্রেশনের history আছে।

এবারেরটা যে সেই ডিপ্রেশনেরই আরও গভীরতর রূপ, সেটা বুঝতে সুশোভনের ভুল হয়নি।

ডঃ জনসন অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন শুচির সঙ্গে, তারপর ওষুধের প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন।

একদম ওষুধ কিনে, বাড়ী ফিরলো দু'জনে।

পরেরদিন থেকে ওষুধ শুরু হলো। সুশোভন নিজের হাতে ওষুধটা এনে দিতো রোজ।

শুচির যুদ্ধটা দেখতে পেতো ও – আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে ভাসিয়ে রাখার যুদ্ধ ...।

কিন্তু সুশোভন-ই বা কি করবে ? ওর নিজের মধ্যেও যে আর শক্তি নেই কাউকে টেনে তোলার !

এখন ওষুধই ভরসা।

তবে চার-পাঁচ মাস চালিয়ে যাওয়ার পর, ওষুধে কিছু কাজ হলো।

চাকরি না করলেও, দিনের কাজগুলো নিয়মিত করতে শুরু করলো শুচি।

কখনো কখনো সুশোভনের সঙ্গে বাইরেও বেরোতে শুরু করলো – গ্রসারী স্টোর্সে বা ইন্ডিয়ান দোকানে।

সেখানেই একদিন দেখা হয়ে গেলো অসীম-রুমার সঙ্গে – ওরাও ইন্ডিয়ান মশলা কিনতে এসেছিলো।

ওদের বাড়ীর কাছাকাছি ভালো ইন্ডিয়ান দোকান নেই, মাসের বাজার করতে অসীম-রুমা বরাবর এখানেই আসে – এটাই এখানকার সবচেয়ে বড়ো ইন্ডিয়ান গ্রসারী চেনন।

ওরা প্রথমে একটু আড়ষ্ট হয়ে গেছিলো, কিন্তু শুচিই এগিয়ে গিয়ে কথা বললো। সবার খবরাখবর নিলো।

রুমাই কথা বললো বেশী, অসীম যাওয়ার সময় সুশোভনের হাতে একটু চাপ দিয়ে চলে গেলো।

ফেরার পথে, গাড়ীতে উঠে, বহুদিন পরে সেদিন শুচি গাড়ীর ক্যাসেট প্লেয়ারটা অন্ করলো।

শুচির প্রিয় ক্যাসেটে বেজে উঠলো – "... কতোবার যে নিভলো বাতি / গর্জে এলো ঝড়ের রাতি / সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়ের এই ঠেলা ... নয় নয় এ' মধুর খেলা।"

একবছর ধরে একই ক্যাসেট রয়েছে গাড়ীতে – শোনাও হয়নি, পাল্টানোও হয়নি।

শুচির চোখ দিয়ে নিঃশব্দে নেমে এলো জলের ধারা।

সুশোভন চুপচাপ গাড়ী চালাতে লাগলো।

বাড়ী ফিরে শুচি খুলে বসলো লাপ্পার গানের খাতা।

সুশোভন একটা বিয়ারের বোতল নিয়ে বাইরের ঘরে বসে টিভিটা অন্ করে দিলো।

সেই একই খবর, ঘুরে ফিরে।

নতুন আর বলারই বা কি আছে !

এই জীবনটারই মতো প্রায় – নতুন করে আর কিছু পাওয়ার নেই, তাই পুরোনো গলিতে পাক খেয়ে মরা।

যে সুশোভন জীবনের সব গুরুগম্ভীর আলোচনাকে হাসির স্রোতে ভাসিয়ে দিতো, সেই সুশোভন এখন হাসতেই ভুলে গেছে। চেষ্টা করলেও আর একটা জোক মনে পড়ে না। সারাক্ষণ বুকের ওপর একটা পাথর চাপানো আছে মনে হয়, যার ওজনটা দিন দিন বাড়ছে।

দোকানের দিকেও আর মন দেয় না। মাঝে মাঝে যায়, বাকীটা কেটি সামলায়।

কেটি বারবার বলে ওকে নতুন দোকানটা দেখতে, কিন্তু সুশোভনের যেন বৈরাগ্য এসে গেছে সবেতেই।

যায়, কিন্তু মন পড়ে থাকে পেছনে।

লাপ্পার সঙ্গে কাটানো অমূল্য মুহূর্তগুলো মনে পড়ে যায়।

মাত্রই তো ক'টা বছরের অতিথি হয়ে এসেছিলো ছেলেটা – কেন যে সুশোভন ব্যবসা ভুলে ওকে আরও বেশী সময় দ্যায়নি তখন ! ভাবলে নিজের ওপরই রাগ হয়, তার পর আসে হতাশা। ... এখন আর ভেবে লাভ কি ? সময় তো পেরিয়ে গেছে। শুচির গলায় বহুদিন আগে শোনা সেই গানের মতো – "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না" ... বুকে চাপ বাড়তে থাকে।

শুচি একদিন সুশোভনকে বললো – "তুমিও কেন ডঃ জনসনের ওষুধ খাচ্ছো না ?"

সুশোভন বললো – "আমি ? কেন ?"

শুচি বললো – "তোমার চেহারাটাও ভালো দেখাচ্ছে না।"

সুশোভন একটু হাসলো – "আরে, এটা 'one size fits all' নয়।"

শুচি বললো – "তাহলে তোমার size-এর ওষুধটাই নাও।"

সুশোভন হাসলো – "তার চেয়ে তুমি একটা গান গাও। সেটাই ওষুধ – তোমারও, আমারও।"

শুচি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো।

তারপর জানলার বাইরে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে গেয়ে উঠলো – "দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে / আমার সুরগুলি পায় চরণ আমি পাইনে তোমারে। ..."

অন্ধকার হয়ে গেলো, কেউ উঠে আলো জ্বাললো না।

সোফায় স্থির হয়ে বসে রইলো দু'জনে।

ঘরের মধ্যে, "নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে", পাক খেয়ে ঘুরতে লাগলো বেদনাবিদ্ধ সুরের ধারা।

অব্যক্ত আবেগের চেয়ে এই বেদনার প্রকাশ বোধহয় শতগুণে ভাল। ডঃ জনসন্ তো তাই বলেন।

সুশোভনের আশা হলো যে শুচি ভালোর দিকে যাচ্ছে, ওষুধে কাজ হচ্ছে।

শুচি আবেগ প্রকাশ করছে, চারপাশে নজর দিচ্ছে।

শুচিকে ভালো হতেই হবে, শক্ত হতেই হবে – জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

শীতটা এ'দেশে ঝপ করে এসে যায়।

Summer পেরিয়ে, fall এলো কি না এলো – হঠাৎ রোদ্দুর হয়ে যাবে ঠাণ্ডা, গাছগুলো নিরাবরণ, heating on করে দিতে হবে।

সুশোভন কানাডার ইমিগ্রেশনের জন্য এ্যাপ্লাই করেছে শুনে, শুচি প্রথমেই বলেছিলো – "ও বাবা ! সে তো উত্তর মেরু ! আর জায়গা পেলে না যাওয়ার – তুমি কি পোলার বেয়ার ?"

সুশোভন বলেছিলো – "আরে, না না ! আমি যেখানে যাওয়ার প্ল্যান করছি, সেখানে অত ঠাণ্ডা নয়। তবে হ্যাঁ, কলকাতা বা বম্বের চেয়ে একটু বেশী ঠাণ্ডা তো বটেই।"

"একটু বেশী" নয়, "অনেকগুণ বেশী" ঠাণ্ডা – সেটা এসে বুঝেছে শুচি।

তবে দেশটা এতোই সুন্দর, জীবেনযাত্রা এতোটাই পরিচ্ছন্ন ও পরিমার্জিত, যে ঠাণ্ডাটা কিছু বড়ো জিনিস বলে আর মনে হয় না।

আর সুশোভনের কথা অনুযায়ী – "Life is a package - you cannot get best of both worlds." খুবই সত্যি কথা সেটা। ঠাণ্ডার দেশ বলেই বোধহয় এ'দেশের মানুষের পরিশ্রম করার ক্ষমতা এতো বেশী।

ঠাণ্ডাটাও এই জীবনযাত্রার একটা অঙ্গ।

প্রতি বছরের মতোই, অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে ঠাণ্ডাটা জাঁকিয়ে বসলো।

সুশোভনের ড্রিঙ্ক করাটাও গেলো বেড়ে।

শুচি একদিন বললো – "তুমি কিন্তু এখন week-days-এও drink করছো।"

সুশোভন বললো – "এই ... গা গরম করছি, যা ঠাণ্ডা !"

শুচি বললো – "ঘরের ভেতরে আর কি ঠাণ্ডা ? তুমি তো এখন ভোরে উঠে আর দোকানে যাও না !"

সুশোভন বললো – "তাতে কি ? থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে বাইরের temperature দেখলেই শীত করছে।"

শুচি বললো – "বয়স হচ্ছে, exercise করছো না – drinks-টা কমাও।"

সুশোভন টিভি অন্ করতে করতে অন্যমনস্কভাবে বললো – "কেউ তো নেই যে 'bad example' দেখে শিখে যাবে ... কি হবে অতো কড়াকড়ি করে ?"

শুচি চুপ করে গেলো, আর কথা বাড়ালো না।

হঠাৎ যেন ঘরের হাওয়া কমে গেলো, সব কথা ফুরিয়ে গেলো। শুচি আস্তে আস্তে উঠে এলো।

অনেকদিন পর লাপ্পার ঘরের দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকলো।

পড়ার টেবিলে কম্প্যুটারটা রাখা, পাশে বই-খাতা পেন্সিলবক্স।

টেস্ট-অফ-ড্রয়ারের ওপর একটা ছবি – কেক কাটছে, পাঁচবছরের জন্মদিনে।

তখন কে জানতো যে পরের milestone birthday-টা আর ছোঁওয়া হবে না লাপ্পার !

দরজাটা আবার আস্তে করে বন্ধ করে দিলো শুচি।

নিজেদের বেডরুমের জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো।

পেছনে জঙ্গল আর পাহাড়ের ঢাল – তার ওপর দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে পড়ন্ত সূর্যের শেষ আলো। শীতের সন্ধ্যা নামছে দ্রুত।

আরেকটু পড়েই ডিনার দিয়ে দেবে – তাহলে সুশোভনের drink করাটা বন্ধ হবে।

এ'দেশে আসার পর আর দেশে বেড়াতে যায়নি ওরা।

ইচ্ছেও করতো না – কার সঙ্গেই বা দেখা করতে যাবে ?

প্রথমদিকে অবশ্য সময়ও ছিলো না। ব্যবসা দাঁড় করাতে হবে – লন্ড্রি তো বারোমাসই খোলা।

লাপ্পার জন্মের পর ওরা দোটানায় পড়েছিলো।

লাপ্পাকে দেশে নিয়ে গিয়ে দাদু-ঠাকুমা-দিদিমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু দেশে সবাই দু'হাত বাড়িয়ে লাপ্পাকে স্বাগত জানাবে কিনা, সেটা ভাবতে ভাবতেই সময় পার হয়ে গেলো। লাপ্পার দু-আড়াই বছর বয়সের মধ্যে শুচি-সুশোভনের মা-বাবারা সবাই পাট গুটিয়ে চলে গেলেন।

তারপর আর দেশে যাওয়ার কথা তোলেনি কেউই।

দেখতো বন্ধু-বান্ধবরা ডিসেম্বরে Christmas-এর ছুটিতে বা summer-এ স্কুল ছুটির সময় দেশে বেড়াতে যাচ্ছে। ওরা লাপ্পাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতো বেড়াতে। Disney Land, Sea World, Las Vegas – লাপ্পা বছর চারেকের হয়ে যাওয়ার পর, অনেক জায়গায় ঘুরেছে। কিন্তু দেশে নয়।

এবারে যেন দেশ ডাকছে।

শুচি সুশোভনকে বললো – "চলো, এই ডিসেম্বরের ছুটিতে দেশে ঘুরে আসি। Christmas- eve থেকে New Year's Day অবধি নাহয় একটা দোকান বন্ধ রাখো – আরেকটা কেটি ম্যানেজ করে দেবে।"

সুশোভন বললো – "হঠাৎ ?"

শুচি বললো – "পুরোনো জায়গাগুলো দেখতে ইচ্ছে করে।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুশোভন বললো – "চাইলেও কি আর পুরোনো জীবনে ফেরা যায় ? ... শুধু পুরোনো গলিতে হেঁটে কি হবে ? ... Life is a one-way street, নিজেরাই একদিন এই রাস্তা বেছে নিয়েছিলাম ... যতো অসহ্যই হোক – এই পথেই হেঁটে যেতে হবে। এখানেই destiny – এখানেই শেষ নিঃশ্বাস পড়বে একদিন ... পার্মানেন্ট ছুটি।"

বিশ্বাস হয় না যে এই সেই সুশোভন, যে কিনা একসময় তুড়ি মেরে জীবনের সব সমস্যা উড়িয়ে দিতো। শুচি চুপ করে বাইরে তাকিয়ে রইলো।

বাইরে স্নো পড়ছে। সবুজ লনের ওপর ঘন হয়ে জমেছে পাঁচ ইঞ্চি বরফ।

সেই বরফের ওপরেই যে সত্যি সত্যি শেষ নিঃশ্বাস পড়বে সুশোভনের, এত তাড়াতাড়ি, সেটা শুচি ভাবতেও পারেনি সেদিন।

সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় পুলিশ এসেছিলো বাড়ীতে।

সুশোভনের ওয়ালেটে রাখা ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে, বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে।

দোকান থেকে ফেরার পথে, সুশোভনের গাড়ী বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিলো রাস্তার ধারের ঢালে। সদা-সাবধানী সুশোভন সেদিন সীটবেল্ট পড়েনি – ভাঙা গাড়ী থেকে বডিটা ছিটকে গিয়ে পড়েছিলো পাঁচফুট দূরে, বরফের ওপর। দিনটা ছিলো ডিসেম্বরের কুড়ি তারিখ।

Autopsy রিপোর্ট অনুযায়ী, সুশোভনের হার্ট নাকি বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো শরীরটা মাটিতে আঘাত করার আগেই। তাই বোঝা যাচ্ছে না যে ম্যাসিভ হার্ট এ্যাটাকের জন্যই এ্যাকসিডেন্টটা হলো, নাকি এ্যাকসিডেন্টটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও হার্টফেল করেছিলো – এনলার্জড হার্ট এবং আরো কিছু আনুষঙ্গিক সমস্যা তো ছিলই ! ... পুলিশ এইসব তথ্য জানিয়ে, একদিন পরে সুশোভনের বডি release করলো। কেটি আর ওর বয়ফ্রেণ্ডই সব ব্যবস্থা করলো – বডি নেওয়া থেকে ক্রিমেশন পর্যন্ত। কেটিকেই শুধু ফোন করেছিলো শুচি, পুলিশের সঙ্গে হাসপাতালে যাওয়ার আগে।

সত্যি ? সুশোভনের হার্টের সমস্যা ছিলো ? কবে থেকে ? ... লাপ্পা চলে যাওয়ার পরই কি এটা হয়েছিলো ... শুচি তো কিছুই জানতো না। না শুচি জানার মতো অবস্থায় ছিলো, না সুশোভন ওকে জানিয়েছিলো। অথচ নিজে একটা উইল করেছিলো মাস তিনেক আগে, সবকিছুর উত্তরাধিকারী করে গেছে শুচিকে। তবে কি সুশোভন আন্দাজ করেছিলো ওর শরীরের অবস্থা ? ও কি বাঁচার ইচ্ছেটাই হারিয়ে ফেলেছিলো ? তাই প্রায়-ডুবন্ত শুচিকে ডঃ জনসনের হাত ধরে তীরে উঠিয়ে দিয়েই, ও নিজে বিদায় নিলো ?

কিন্তু কোনো প্রশ্নেরই আর উত্তর মিলবে না – সুশোভন সব প্রশ্নোত্তরের বাইরে চলে গেলো, মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে, শুচিকে একা রেখে ... সব ফেলে যাওয়া কাজ শেষ করার জন্য।

সুশোভন নেই মনে করানোর জন্য, তবু শুচি নিয়মিত ওষুধ খাচ্ছে – খেতে হচ্ছে। দোকানে যেতে হচ্ছে, কর্মচারীদের মাইনে দিতে হচ্ছে। সব কাগজপত্র দেখে ঠিকঠাক করতে হচ্ছে। ডঃ জনসন মাঝে মাঝে ফোন করে খোঁজ নেন।

শুচি এদেশে কখনোই গাড়ী চালায়নি। ও বরাবর পাবলিক ট্রান্সপোর্টেই অফিস যাতায়াত করেছে।

তাছাড়া এ্যাকসিডেন্টের পর গাড়ীটা পুরোই ভেঙে গেছিলো – junk-yard-এ চলে গেছে। বাসে করেই এখন যাতায়াত করে শুচি। দোকানে যেতেই হয়, গ্রসারিও করতে হয়।

সুশোভনের ক্রিমেশনের পরদিন, নির্জন বাড়ীতে, শুচি গিয়ে ঢুকেছিলো সুশোভনের স্টাডিতে।

ঠিক টেবিলের ওপরেই রাখা ছিলো একটা ফাইল – যেন ওর জন্যই গুছিয়ে রেখে গিয়েছে সুশোভন।

ওটা নিয়ে এসে বসেছিলো সোফায়, আর একটা একটা করে দেখেছিলো কাগজগুলো।

বাড়ীর মর্টগেজ, পার্সোনাল আর বিজনেসের দু'টো আলাদা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, উইল বানানো ল-ফার্মের কাগজ, দুটো দোকানের অ্যাকাউন্টের একটা মোটামুটি হিসেব, লাইফ ইনশিওরেন্স পলিসির একটা কাগজ।

এইসব কোনদিন আগে দেখেনি শুচি, এখন বাধ্য হয়েই দেখতে শুরু করলো।

ব্যবসার অবস্থা খুব একটা ভালো না। লাপ্পা মারা যাওয়ার পর থেকে সুশোভন প্রায় কিছুই দেখতো না।

নতুন কেনা দোকানটায় অনেক loss হয়েছে, এবং এখনও হচ্ছে। সুশোভন ওটাকে দাঁড় করানোর জন্য কিছুই করে উঠতে পারেনি।

অন্য দোকানটা ভালোই চলছিলো, কিন্তু দেখাশোনার অভাবে ইদানীং হোটেলের কন্ট্রাক্টগুলো আর রিনিউ হয়নি। ফ্লায়ারগুলো ঠিক সময়ে যাচ্ছে না।

লাইফ ইনশিওরেন্সের অফিসে ফোন করে জানলো যে সেখান থেকে মাসখানেক আগে ফর্ম আনিয়েছিলো সুশোভন। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট শুদ্ধ ফর্ম জমা দেওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু সেটা আর জমা পড়েনি অফিসে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দেখে শুচি বুঝলো যে সত্যিই পলিসিটা আর করে ওঠা হয়নি সুশোভনের।

শুচি ব্যবসা বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো, বাড়ীও। একটু ক্ষতি স্বীকার করেই বিক্রি করতে হলো সব। তবুও টাকা যা পেলো, তাতে ব্যাঙ্কের লোন সব শোধ করে দেওয়া গেলো। ব্যবসা বাড়াতে লোন নিয়েছিলো সুশোভন, আর বাড়ী তো এদেশে সবাই লোনেই কেনে। তারপর ফার্নিচারও বিক্রি করে দিলো।

বাসন, দুটো স্যুটকেস, ব্যাগ, নিজের কিছু পুরোনো জামাকাপড় আর সুশোভনের সব জামাকাপড় Salvation Army-কে দিয়ে দিলো।

একটা একটা করে সব ব্যবস্থা করতে প্রায় সাত-আট মাস লেগে গেলো।

অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি বাড়ীর closing হলো, নতুন মালিক সেপ্টেম্বরের প্রথমে Labor Day weekend-এর ছুটিতে বাড়ীর দখল নেবেন। অগাস্টের ২৯শে ফার্নিচার সব চলে যাবে।

সেই রাতটা এয়ারপোর্ট হোটেলে থেকে, ৩০ তারিখে দেশের ফ্লাইট নেবে শুচি – গন্তব্য বোম্বে।

ঐ দু'সপ্তাহে শুচি ওর সেই দেশ থেকে আনা পুরোনো দুটো স্যুটকেসে নিজের সামান্য জিনিস ভরে নিলো।

নিজের মনেই একটু হাসলো ও – জীবনের সব যোগ-বিয়োগের শেষ ফল শূন্য।

যেখান থেকে যা এনেছি, ততটুকুই নিয়ে ফিরবো।

আর জীবনের শেষদিনে, ফিরবো খালি হাতে – ঠিক যেমন করে এসেছিলাম।

শুধু দু'টো নতুন জিনিস ঢুকলো এবারে স্যুটকেসে – লাপ্পার ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি আর সুশোভনের ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি। আর অগুণতি স্মৃতিরা, যাদের ইমিগ্রেশন ধরতে-ছুঁতে পারবে না।

দরজা লক করে, রিয়েল এস্টেট এজেন্টের হাতে চাবি দিয়ে, শুচি মনে মনে বললো – "সুশোভন, তোমার হাত ধরে এদেশে এসেছিলাম ... আজ এখানে একা থাকি কি করে, বলো ? তুমি আমায় স্বর্গদর্শন করিয়েছিলে ... জানি না এরপর নরকদর্শনের পালা আসবে কিনা ... তবে আপাতত ফিরে চললাম মর্ত্যে। তুমি এখানেই থাকতে চেয়েছিলে – তাই তোমাকে এখানেই রেখে গেলাম, শুধু স্মৃতিটুকু নিলাম সঙ্গে। ভালো থেকো।"

(১৪)

"তুমি কি রামায়ণ পড়েছো, রীতি ? বাপ্পাকে আমি পড়ে শুনিয়েছিলাম ... তারপর তো সিরিয়ালও হলো। তোমার জন্যে কিছুই করতে পারিনি, সত্যি তুমি রাগ করতেই পারো ! আসলে একটা জীবন যখন ঝড়ে এলোমেলো হয়ে যায়, তখন collateral damage যে কত হয় তার হিসেব রাখা সেইমুহূর্তে প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। পরে যখন হিসেব কষার সময় আসে, তখন too late ... আর damage control-এর সময় থাকে না। আমারও তাই হয়েছিলো।

চাকরি না করতে পারার আফসোশটা আমার ফিরে ফিরে আসতো – যখন দেখতাম বাপ্পা একটা sneaker কিনতে চাইছে বন্ধুদের দেখে, কিন্তু দিতে পারছি না। গান শিখতে ইচ্ছে করছে, পারছি না। রান্নার লোক রাখতে চাইছি, তাদের অনেক মাইনে। ঘুরেফিরে সবেতেই "না"।

পয়সার একটা ব্যাপার তো ছিলই – সরকারী চাকরির প্রথমদিকে এমনটাই ছিলো তখন। কিন্তু তাছাড়াও আরেকটা কারণ ছিলো – সেটা তোমার ঠাকুরমা। ওনার অমতে তোমার বাবা কিছুই করতেন না, আর আমার কোনো ইচ্ছেতেই উনি মত দিতেন না। কেন যে উনি আমাকে এতোটা বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখতেন সেটা তখন একেবারেই বুঝতে পারিনি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় যে মানুষ নিজে যা পায় না, তা কাউকে বোধহয় দিতেও পারে না ... বিশেষ করে মেয়েরা – কেউ কেউ পারে, তবে তারা অসাধারণ। তোমার ঠাকুমা ছিলেন খুবই সাধারণ, সবদিক দিয়েই – চেহারাতেও, স্বভাবেও। আমি যে দেখতে মোটামুটি ভালো ছিলাম, সেটাও ওনার চক্ষুশূল ছিলো। বিয়ের পরে কোনো আত্মীয়রা যদি বলতেন – "বৌ কিন্তু তোমার খুব সুন্দরী হয়েছে ...", সঙ্গে সঙ্গে উনি বলতেন – "যৌবনে কুকুরটাও সুন্দরী ... আর ঐরকম সারাক্ষণ সেজেগুজে ঢলানিপনা করলে আমাদেরও সুন্দর লাগতো ... কাজকর্ম করতে হলে দু'দিনে রূপ বেরিয়ে যাবে !" আমার প্রথমটায় খুব অবাক লাগতো, পরে রাগ হতো – আমার বাড়ীর কাজ কি পাড়া-প্রতিবেশী এসে করে দিয়ে যায় ? ...

এখন ওনার কথা ভাবলে আমার খানিকটা করুণা হয়, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আর কোনো রাস্তা জানা ছিলো না ওনার। কিন্তু এটা ভেবে রাগও হয় যে কেন ওনাদের এটা করতে দেওয়া হোতো – কত সংসারের সুখ-শান্তি জ্বলে গেছে ওনাদের মতো মহিলাদের এইসব আচরণের জন্যে। কেউ কোনদিন বাধা দ্যায়নি।

তোমার যদি কোনদিন ছেলে হয়, মানে যদি তুমি কোনদিন তাতে ইচ্ছুক হও, তাহলে আমি নিশ্চিত যে তুমি তোমার ছেলের বৌকে বা partner-কে বন্ধুর মতো দেখবে – কারণ তুমি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছো ! যিনি নিজের অল্পবয়সে ঐ স্বাদ পাননি, তাঁর কাছ থেকে সেই উদারতাটা আশা করা হয়তো আমার ভুল হয়েছিলো। কিন্তু তোমার বাবাও কখনো চেষ্টা করেননি তোমার ঠাকুমার একটু অবাধ্য হয়ে, আমাকে একটু খুশী করতে। আসলে এখানেই আমার আঘাত লেগেছিলো বেশী – কারণ তোমার বাবার কাছে আমি অন্যকিছু আশা করেছিলাম।

সেটাও মেনে নিয়েছিলাম, কিন্তু মানতে পারলাম না অন্য কিছু ! কি মানতে পারলাম না সেটা পরে বলছি, তার আগে বলি তোমায় রামায়ণের কথা জিজ্ঞেস করলাম কেন।

রামায়ণের অহল্যাকে মনে পড়ে ? গৌতমমুনির স্ত্রী অহল্যা – পাষাণ হয়ে থেকে গিয়েছিলেন। খুব interesting গল্প – পারলে একবার পড়ে নিও।

পিতৃতন্ত্র আজও আছে, জানো ! মাতৃকূল নিজেদের অজান্তে, নিজেদের স্বধর্মবিদ্বেষে, আসলে সেই পিতৃতন্ত্রকেই পুষ্ট করে যাচ্ছে। কি সত্যযুগ, কি কলিযুগ – পিতৃতন্ত্রের নীচে সব অহল্যারাই পাষাণ হয়ে যায়। কেন হয়ে যায় সেটা জানার চেষ্টা করাও বৃথা। এর উল্টোটা কিন্তু কখনো হয় না – তোমার ঠাকুমার ভাষায় "সোনার আংটি আবার বাঁকা !" এইরকম অনেক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত বাঁকা আংটিকে পুজো করতে দেখেছি তোমার ঠাকুমাকে, এবং আরও অনেককে। কিন্তু পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে গেলেই ঘটনার রঙ বদলে যায়। স্ত্রীলিঙ্গের জন্যে সমাজ এবং সংসার সর্বদাই ক্ষমাহীন ও একপেশে।

যদি অহল্যাদের কথা বলতে দেওয়া যায়, তবে হয়তো অনেক "কেন"র উত্তর পাওয়া যাবে। কিন্তু কে শুনবে তাদের কথা, বলো? ... অহল্যাদের তাই পাষাণ করে দেওয়াই ভালো, বা একটা বাক্সে ঢুকিয়ে তার ওপরে লিখে দেওয়া – "Discarded – পরিত্যক্ত"।

আমাকেও বলতে পারো সেইরকমই এক অহল্যা। তোমার বাবার সঙ্গে অশান্তি যখন চরমে উঠেছিলো, তখন এক ইন্দ্র এসে আমার জীবনকে ছুঁয়েছিলো – সুশোভন। সে আমার অচেনা কেউ ছিলো না, সে আমার অনেকদিনের বন্ধু ... আমার গানের গুণগ্রাহী, আমার হারিয়ে যাওয়া carefree জীবনের একটা টুকরো। তোমার বাবাও চিনতেন তাকে, বোধহয় এটাও ভাবতেন যে তিনি আমার জীবনে খুব দ্রুত আবির্ভূত না হলে সুশোভনের হাত ধরে আমিই হঠাৎ অন্যজীবনে চলে যেতে পারতাম ! তাই বোধহয় এতো তাড়াতাড়ি আমার বাবার কাছে আমার বিয়ের প্রস্তাব রেখেছিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি করলে কোনো কাজই বোধহয় ঠিকভাবে হয় না। যাক সে পুরোনো কথা, যেটা হলো সেটাই বলি।

আমি তখন কল্যাণীতে – তোমাকে নিয়ে pregnant, কয়েকমাস বাকী। সেবারে শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিলো, মনও বিকল – টানা অনেকদিন মায়ের কাছে ছিলাম। বাপ্পার নীচু ক্লাস, পড়ার চাপ নেই – সেও ছিলো আমার সঙ্গে। তোমার বাবা যাতায়াত করছিলেন – তোমার ঠাকুমা-দাদুর বাড়ীতে থাকতেন সপ্তাহের বেশীটা, রবিবারে আমাদের বাড়ী আসতেন, মাঝে একবার করে গিয়ে টালিগঞ্জের বাড়ীটা দেখে আসতেন। আমি আমার মায়ের কাছেই থাকতাম, তোমার ঠাকুমার বাড়ীতে একদিনের জন্যেও যাইনি সেবারে।

দাদার বদলির চাকরি – তখন বৌ নিয়ে ভুবনেশ্বরে আছে। আমার বোন রুচিরও তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে, দুবাইতে থাকে। মা-বাবা মনপ্রাণ দিয়ে যত্ন করতেন আমার আর বাপ্পার। যদিও একটা ভীষণ যন্ত্রণা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো, তবুও সংসারের কাজের থেকে ছুটি পেয়ে একটু যেন আরাম হয়েছিলো।

মাঝে মাঝে হারমোনিয়ামটা নিয়ে বসে গান করতাম। গানের মতো থেরাপি নেই, বিশেষত রবিঠাকুরের গান যদি হয়। সেদিনও বাইরের ঘরে বসে আপনমনে গাইছিলাম – "দিনের বেলায় বাঁশী তোমার বাজিয়েছিলে অনেক সুরে, গানের পরশ প্রাণে এলো ...."

কে যেন পেছন থেকে গাইতে গাইতে ঢুকলো – "আর কি আমি থাকি দূরে ? ...."

আমি চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখি, সুশোভন।

হাসতে হাসতে বললো – "রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম, এ্যাই প্যানপ্যানানী মানেই শুচি – তখনই বুঝেছি !"

আমিও হেসে ফেললাম। এইজন্যেই আমার সুশোভনকে ভালো লাগে – ওর পাশে থাকা মানেই সারাক্ষণ কিছু না কিছু নিয়ে হাসা। এই হাসিটা যে আমার কত দরকার ছিলো, আগে বুঝিনি।

সুশোভন ততক্ষণে হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছে – "ও মাসীমা, কোথায় গেলেন ? আপনার মেয়ের গান কষ্ট করে শুনলাম, হাততালি দিলাম – এবার একটু চা দেবেন তো ? ... তুমি কবে এলে শুচি ?" মা-বাবা এসে বসলেন। চা খেতে খেতে গল্প হলো। সুশোভন পুজো উপলক্ষ্যে বাড়ী এসেছে, ক'দিন আগেই চলে এসেছে, একেবারে লক্ষ্মীপুজো কাটিয়ে

ফিরবে। ওর ব্যবসা মোটামুটি ভালই চলছে, একটি ভালো ম্যানেজার আছে যে সুশোভন না থাকলেও ভালোই সামাল দ্যায় – তাই এবারে ও হাতে খানিকটা সময় নিয়ে এসেছে। দাদার খবর নিলো। মা বললেন যে ও কিছুদিন আগেই এসেছিলো, পুজোর সময় আর ছুটি পাবে না – যদি পারে কালীপুজোয় আসবে, ভাইফোঁটা নিয়ে একেবারে ভাগ্নে বা ভাগ্নীর মুখ দেখে ফিরবে। শুচির তো তার ক'দিন পরেই date !

সুশোভন একবার তাকালো আমার দিকে, কিছু বললো না।

বাপ্পার দিকে তাকিয়ে বললো – "কি মাস্টার, তুবড়ী বানাবে ?"

বাপ্পা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করে রাজী।

"চলো, তাহলে কাল তুমি আর আমি মশলা কিনতে যাবো।" বলে সুশোভন উঠে দাঁড়ালো।

বাপ্পাকে আর পায় কে ! আনন্দে আত্মহারা।

সুশোভন প্রায় রোজই আসে। বাপ্পাকে নিয়ে তুবড়ী বানায়, আমার গান শোনে, মায়ের সঙ্গে খুনসুঁটি করে। আমারও মনটা হাল্কা হয়ে আসে। রবিবারে তোমার বাবাও এলেন, সবাই মিলে সিঙ্গাড়া খাওয়া হলো।

তোমার বাবার সঙ্গে বাইরের ব্যবহার আমি যতটা সম্ভব স্বাভাবিকই রেখেছিলাম, কিন্তু কেন জানি সুশোভনের চোখে কিছু ধরা পড়েছিলো।

দু'দিন বাদে দুপুরে তুবড়ীর মশলা তৈরী করতে করতে হঠাৎ বললো – "তুমি ভালো আছো তো, শুচি ?"

খুবই সামান্য একটা প্রশ্ন, হেসে এড়িয়ে গেলেই হতো – কিন্তু হঠাৎ আমার দু'চোখ ছাপিয়ে জল চলে এলো।

সুশোভন ব্যস্ত হয়ে পড়লো, আমিও অপ্রস্তুত হয়ে উঠে গেলাম। সেদিন আর কোনো কথা হলো না।

কিন্তু কথা উঠলো আবার। আমি সুশোভনকে বললাম যেমন করে পারে যেন আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দ্যায়, নাহলে আমি সত্যি মারা যাবো – আমার দম আটকে আসছে। সুশোভন তখনই কিছু বললো না। ফিরে যাওয়ার দু'দিন আগে, লক্ষ্মীপুজোর দিন প্রসাদ খেয়ে বাড়ী যাওয়ার সময় ওর ফোন নাম্বারটা আমাকে দিলো। বললো – "শুচি, হুট করে কিছু কোরো না। ভাল করে ভেবে দেখো। তোমার বাচ্চাদের কথাও ভাবতে হবে। সব ভেবে চিন্তে যা মনে করবে, আমাকে জানিও। একটা চাকরি যোগাড় হয়তো করে দিতে পারবো তোমাকে, কিন্তু তার আগে পরে অনেক কিছু ভাবার আছে। ... আজ চলি, দরকার মনে করলে ফোন করো।" এই বলে চলে গেলো সুশোভন।

ফোন নাম্বারটা যত্ন করে আমার পার্সে তুলে রাখলাম – মন বলছিলো যে খুব শিগগীরই নাম্বারটা দরকার হবে আমার।

তুমি জন্মেছিলে কালীপুজোর পাঁচদিন আগে। খুব আনন্দ হয়েছিলো তোমাকে দেখে। আমার বড্ড মেয়ের শখ ছিলো। বাপ্পাকে আমি জন্মের পর বেশ কয়েকমাস মেয়েদের মতো বড়ো চুল রেখে ঝোলা ঝোলা জামা পরাতাম। তোমার বাবা পছন্দ করতেন না সেটা, ছেলে ছিলো তোমার বাবার এবং বাবার বাড়ীর সবার গর্বের ধন। আমারই শুধু মেয়ে-মেয়ে মন ছিলো।

তোমার জন্মের পর ক'দিনের জন্য হলেও আমার সেই শখ মিটলো। তোমার ঠাকুমা বাপ্পাকে মুখ দেখে সোনার হার দিয়েছিলেন, তোমার মুখ দেখে একটা আংটি দিলেন। খুব হতাশ হয়েছেন মেয়ে হয়েছে বলে। মেয়েরাই মেয়েদের চায় না – এ' এক অদ্ভুত ব্যাপার!

তবে যাই হোক না কেন, তোমার ঠাকুমার হতাশ মুখ দেখে আমার কিন্তু দুঃখের বদলে আনন্দ হচ্ছিলো – মনে হচ্ছিলো যে চিৎকার করে বলি "সবাই শোনো – মেয়ে হয়েছে আমার!"

"আমি যা করে উঠতে পারিনি, আমার মেয়ে তাই করবে" – তোমায় কোলে নিয়ে সগর্বে ঘোষণা করেছিলাম আমি আটকড়াইয়ের দিনে, যখন "ও, মেয়ে বুঝি !" বলে পাড়া-প্রতিবেশীরা মুখ বেঁকাচ্ছিলো।

কি ভেবে যে কথাটা বলেছিলাম ঠিক জানি না। কোথা থেকে এই জোর এসেছিলো আমার, যখন জানতাম যে আমার নিজের সামনের দিনগুলোই হয়তো ভাসতে চলেছে অনিশ্চিতের পথে ?!

ইচ্ছে থাকলেও যে তোমাকে বা বাপ্পাকে আমি নিজের মতো করে মানুষ করতে পারবো না, এটাও তো পরিষ্কার জেনে গিয়েছিলাম তোমার বাবা এবং ঠাকুমার কাছ থেকে। আমি তখন এতো ক্লান্ত যে কোনো যুদ্ধের দিকে আর মন নেই। "যা পাবো না তাই নিয়ে আর কাড়াকাড়ি করবো না, সে যতো কষ্টই হোক অধিকার ছাড়তে" – এটাই আমি মনকে বুঝিয়ে চলেছিলাম রোজ, তোমার জন্মের কিছু আগে থেকেই। কিন্তু অধিকার তো শুধু বাইরের ছাড়, ভেতরের নয়। ভেতর থেকে আমি যে শক্তি সঞ্চয় করে যাচ্ছিলাম কয়েকমাস ধরে, আমার মন বলছিলো যে সেই আগুন আমার নাড়ী থেকে তোমার নাড়ীতে সঞ্চারিত হবে – হবেই হবে, সে বাঁধন কেউ কাটাতে পারবে না।

তোমার জন্মের পর, তোমার সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত আমি সমস্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাস-লোমকূপ দিয়ে শুষে নিয়েছিলাম সেই সাড়ে পাঁচমাসে। তুমি হয়তো বলবে – "কেন ? যাকে ফেলে চলেই যাবে, তাকে নিয়ে সাড়ে পাঁচমাস কাটানোর দরকারটা কি ছিলো তোমার ? ... In fact, তাকে জন্ম দেওয়ারই বা দরকার কি ছিলো তোমার ? Abortion করিয়ে নিলেই পারতে !"

পারতাম – ইচ্ছে করলে তিনমাসের মধ্যেই abortion করতে পারতাম যেমন তুমি করেছিলে, কারণ আমি তখন দ্বিতীয় কোনো সন্তান আর চাইনি। হ্যাঁ, এটাই সত্যি। তুমি শুনলে হয়তো দুঃখ পাবে, কিন্তু আমি আজ আর লুকোবো না যে তুমি অনাহুতের মতোই এসেছিলে আমার জীবনে – তোমার ঠাকুমার পরিকল্পনায় আর তোমার বাবার সাহচর্যে, আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। আর এ'টাই আমি মেনে নিতে পারিনি। অধিকারহীনতারও একটা সীমা থাকে, তোমার জন্মের ঘটনাটা যেন সেই সীমাও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে আমার জীবনের ওপর, এমনকি আমার শরীরের ওপরও আমার কোনো অধিকার নেই – হবে না কোনোদিন, যদি না আমি এই বাড়ী ছাড়ি।

তোমার ভদ্র-শিক্ষিত বাবা যে তোমার ঠাকুমার কথায় এমনটা করতে পারেন, এটা আমার নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিলো। শুধু কষ্ট নয়, একটা বিতৃষ্ণায় সমস্ত শরীর-মন কুঁকড়ে উঠেছিলো। সেটাই ছিলো তোমার বাবার আর আমার সম্পর্কের মধ্যে ছিঁড়ে-যাওয়া শেষ সুতো।

একটু গোড়া থেকেই বলি। তুমি হওয়ার আগে আমি regular precaution নিতাম, ওষুধে কিছু reaction হওয়ায় সেটা বন্ধ করেছিলাম কিছুদিনের জন্যে। ডাক্তার তার পরিবর্তে তোমার বাবাকে প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন, তোমার বাবা তাতে রাজীও হয়েছিলেন। আমি সেটা জেনে নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমি জানতাম না যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যের এই গোপন তথ্যটাও তোমার ঠাকুমার অগোচর ছিলো না। যাই হোক, ওষুধ বন্ধ করার তিনমাসের মধ্যেই যখন প্রেগন্যান্ট হয়ে গেলাম, তখন খুব অবাক হয়েছিলাম। তোমার বাবাকে বলেওছিলাম সেকথা – হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম যে শতকরা একশোভাগ তো কিছুই গ্যারান্টিড নয়, সেইরকমই হবে। সুতরাং দ্বিতীয়বার মা হওয়ার জন্য তৈরী হলাম। আর তৈরী যখন হলামই, তখন মনেপ্রাণে চাইতে লাগলাম যে এবার যেন মেয়ে হয়।

ইতিমধ্যে পাঁচমাসের সাধ উপলক্ষ্যে তোমার দাদু-ঠাকুমার কল্যাণীর বাড়ীতে গিয়েছিলাম আমরা। দিনের বেলা অনুষ্ঠান হলো – আমার মা, কিছু আত্মীয় আর পাড়া-প্রতিবেশী। সব মিটতে মিটতে বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেলো। দিনে অতো খাওয়া-দাওয়ার পর রাতে সবাই নামমাত্র খেলো।

আমার শরীরটা ভালো না থাকায়, খেয়ে উঠেই শুতে চলে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ টিভির আওয়াজ শুনলাম, বোধহয় সবাই টিভি দেখছিলেন। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘন্টাদুয়েক বাদে ঘুমটা ভেঙে গেলো। বাথরুমে যাওয়ার জন্যে উঠলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি তোমার বাবা আর ঠাকুমা কথা বলছেন, তোমার দাদু শুতে চলে গেছেন। ওনারা আমার দিকে পেছন করে ছিলেন, করিডোর অন্ধকার – আমাকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। এগোতে গিয়ে আমি থমকে গেলাম তোমার ঠাকুমার কথা শুনে – "কেমন বলেছিলাম তোকে, দেখলি ? দ্বিতীয় বাচ্চা হলো, কি না ? ... যা বলবো তাই শুনে চলবি, নাহলে ঐ বৌকে সামলানো তোর কম্মো নয় ! .... পুরুষমানুষ বাঁধবে নিজেকে আর উনি বিবিয়ানি করে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াবেন ! কী, না "আর বাচ্চা চাই না ... চাকরি করবো !" শখের প্রাণ, গড়ের মাঠ ! ব্যানার্জ্জীবাড়ীর বৌ করবে চাকরি ! এখন দুই বাচ্চা সামলাতে সামলাতে আর ট্যাঁ-ফুঁ করতে পারবে না। যত্তোসব ! ... বাপের বাড়ী বেশী যেতে দিবি না ওকে – বড্ডো ঢিলেঢালা বাড়ী ওদের। বাচ্চারা যেন ও "বাড়ীর ধারা না পায় – ব্যানার্জ্জীবাড়ীর মতো করে বড়ো করবি, শাসনে রাখবি যাতে মানুষ হয়। আর বৌকে-ও একটু শাসনে রাখবি।"

আমি স্থির হয়ে গেলাম, এক পা পিছিয়ে আবার ঘরে ঢুকলাম। তারপর একটু সামলে নিয়ে, সাড়াশব্দ দিয়ে বাথরুমে গেলাম। তোমার ঠাকুমার কোনো কথা শোনার আর প্রবৃত্তি ছিলো না আমার। সত্যি বলতে, তোমার বাবা বা ঠাকুমা কারুর দিকে তাকাতেই আর ইচ্ছে করছিলো না আমার। মনে হচ্ছিলো যে আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে – এর পরে তোমার বাবার ওপর বিশ্বাস রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে গিয়েছিলো।

পুরো সত্যিটা জানার জন্যে আমি কিছু খোঁজখবরও করেছিলাম – তোমার বাবা সত্যিই কোনো প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেননি এবং সেটা তিনি আমার কাছে লুকিয়ে গিয়েছিলেন। ... এর কিছুদিন পরেই আমি কল্যাণীতে মা-বাবার কাছে চলে গিয়েছিলাম – বাকী প্রেগন্যান্সি এবং তার পরের সাড়ে পাঁচমাস ওখানেই ছিলাম।

তারপর বাড়ী ছেড়েছিলাম, তোমাদের ছেড়েছিলাম। তারও বেশ কিছুদিন পরে, যখন তোমাদের কাছে ফেরার পথ সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করে দিলেন তোমার বাবা ও ঠাকুমা, তখন সুশোভনকে বিয়ে করেছিলাম। আবার মা হয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই শেষ পর্যন্ত টিঁকে রইলো না – বাপ্পা হয়তো তোমাকে বলেছে সেসব কথা ... লাপ্পা আর সুশোভনের মৃত্যুর কথাও। সে যাক গে, ঈশ্বর ভাগ্যে যতটুকু দিয়েছেন ততটুকুই তো পাবো !

তবে এই হলো তোমার জন্মের গল্প – যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার বাড়ী ছাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ, যা আমি আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি। কেউ বুঝবে, এমন বিশ্বাস ছিলো না। আজ এতো বছর পরে মনে হলো যে তুমি আমার বিচার করলেও, হয়তো বুঝবে আমি সেইদিন ঠিক কি জন্য কি করেছিলাম। তাই তোমার খারাপ লাগবে জেনেও তোমাকে সব বললাম – তোমার বিচারও মাথা পেতে নেওয়ার জন্য তৈরী থাকলাম, এইজন্মে বা পরজন্মে।

মন খারাপ কোরো না, কারণ এটা কোনো ব্যক্তিগত ভালোবাসার সঙ্গে জড়িত নির্ণয় নয়। বাপ্পা আর তুমি আমার কাছে আলাদা নও। আমি তোমার জন্ম চাইনি এটা সত্যি, যদিও তার প্রধান কারণ ছিলো অর্থনৈতিক। কিন্তু যখন তুমি বীজ হয়ে এসেই গেছো তখন তোমার কাছ থেকে জীবনের অধিকারটা আমি ছিনিয়েও নিতে চাইনি।

আচ্ছা তোমার কাছে কোনটা বেশী অন্যায় বলে মনে হয়, বলো তো ? তোমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া, না তোমাকে পৃথিবীর আলো দেখতে না দেওয়া ? ... আমার তো মনে হয় যে মা হয়ে দুটো নির্ণয় নেওয়াই খুব কঠিন।

তোমার বাবার সংসার ছেড়ে না গিয়ে আমার উপায় ছিলো না রীতি, আশাকরি তুমি সেটা বুঝেছো। কিন্তু তোমাকে জন্ম দেওয়ার উপায় আমার ছিলো, তাই দাঁতে দাঁত চেপে কয়েকমাস কাটিয়ে সেই কাজটা আমি করে এসেছিলাম।

রক্তের সম্পর্কহীন যে ভালোবাসা, সে ভালোবাসা ফুরিয়ে গেলে ... বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেলে ... সবকিছু যে পাঁচমিনিটেই শেষ করে দেওয়া যায় এটা তো তুমি জানোই। তুমি করেছো, আমিও করতে পারতাম। তাই তোমার বাবাকে ছেড়ে যেতে

পারতাম যে কোনদিন, কিন্তু তোমাকে নয়। রক্তের টান বড়ো কঠিন! তাছাড়া,

একেবারে অসহায় দুগ্ধপোষ্য একটি শিশুকে ছেড়ে যাওয়ার মতো হৃদয়হীন বা চরিত্রহীন আমি সত্যিই ছিলাম না – আমার মুখের এই কথাটা আজ তুমি বিশ্বাস করতে পারো, রীতি।

আমাকে বলা হয়েছিলো যে আমার ছায়া তোমার বা বাপ্পার ওপর পড়লে তোমরা মানুষ হবে না, তাই আমি আমার ছায়াটাই সরিয়ে নিলাম। তাছাড়া যে পথে আমি পা বাড়াতে যাচ্ছিলাম, তার অনিশ্চয়তার মধ্যে তোমাদের টেনে আনা একেবারেই অসম্ভব ছিলো সেই মুহূর্তে। কিন্তু যে জায়গায় থাকলে ব্যানার্জ্জী পরিবারের তোমাকে বড়ো করে তুলতে অসুবিধা হবে না, তোমাকে আমি সযত্নে পরম স্নেহে সেই জায়গা অবধি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম। তারপর চোখের জল মুছে, স রৈ গিয়েছিলাম। আমার কাছে সেটাই ঠিক বলে মনে হয়েছিলো। জানি, তুমি একমত হবে না। কি আর করা, বলো ? একজনের কাছে যা ঠিক, আরেকজনের কাছে সেটাই ভুল। আপেক্ষিকতার সূত্রে জীবনের সব ভালোমন্দের বিচার হয় –এটারও নাহয় তাই হোক।"

সিস্টার এসে দাঁড়ালেন – "এবার তো ঘুমোতে হবে।"

শুচি একটু হেসে চশমা খুলে রাখলেন – "নিশ্চয়ই।"

তারপর কি ভেবে, সিস্টারকে আবার ডাকলেন।

বললেন – "দু'টো খাম পাওয়া যাবে কি ? ... একটু বড়ো এনভেলাপ ... চিঠি দেওয়ার মতো।"

সিস্টার বললেন – "এখুনি এনে দিচ্ছি।"

শুচি উঠে বাথরুমে গেলেন।

(চলবে)

১৯৯০ থেকে আমেরিকা প্রবাসী **ডঃ শকুন্তলা চৌধুরী** কর্মসূত্রে এবং ভ্রমণপ্রিয়তার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষাকে আপন করে নিলেও, বারবার ফিরে ফিরে আসেন এই বাংলায়, তাঁর মাতৃভাষার কাছে এক পরম ভালোবাসার টানে। ক্লাস ওয়ানে পড়ার সময় স্কুলের পত্রিকায় প্রথম একটি কবিতা প্রকাশ হয়। সেই শুরু, তারপর কলেজ, ইউনিভার্সিটি... প্রবাসের বঙ্গ সম্মেলন এবং আরো নানা পত্রিকায় লেখালেখির ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন, যদিও পেশাগত এবং পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে সে ধারাটি ছিল নেহাতই ক্ষীণকায় নদীর মতো। দুই মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর, ব্যস্ততা একটু কমতেই ... সাহিত্যচর্চার আপাত শীর্ণ নদীটির মধ্য থেকে ফলগুধারা যেন এসে পড়লো সাগরের মোহনায় ! এই জানুয়ারিতে কলকাতায় প্রকাশিত তাঁর বই "পৃথা" বিদগ্ধ পাঠকমহলে সমাদৃত। ছাত্রজীবন, গোখেল কলেজের অধ্যাপনা, প্রবাসজীবন ও বাস্তব পৃথিবীর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা আলো ফেলে তাঁর লেখায়... সেভাবেই একদিন লেখা হয় 'পরবাসী'।

সত্যজিৎ অধিকারী

বিহান

সকাল থেকে এমন বৃষ্টি যা থামার নাম নেই। পাহাড়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি ব্যাপারটা চরম একঘেয়ে হয়ে ওঠে। পানীয় জলের সংকট, ইলেকট্রিসিটি নেই, খাদ্য যৎসামান্য, বিছানা স্যাঁতসেঁতে। কি একটা নাকি প্রবল ঘূর্ণিঝড় আসছে তাই কলকাতা থেকে দু-একটা সহানুভূতির ফোন কল পাওয়া গেছে। তবে সুরাহা তাতে কিছুই হয় নি। করণীয় বলতে প্রায় কিছুই নেই। এইসব দিনে বই পড়ার খাটুনি টুকুও করতে ইচ্ছা করে না। এমন না করার দিনে বিহানের কথা ভাবা যায়। এখন কি করছে বিহান ? বহু বছর আর ওদিকে যাই না।

রাত বারোটা। বাড়ি যাওয়ার শেষ ট্রেন মিস করেছি। ভোটের বাজারে কলকাতার এদিকে ওদিকে কারফিউ। পকেটমানির জন্য ভোটের সময় ঠিকাদারি ক্যামেরার কাজে গিয়েছিলাম বেলুড়ে। প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে রেকর্ডিং জমা করে রিলিজ নিতে দেরি হয় গেল। পেমেন্ট পাইনি। কবে পাব জানিও না। একজন বীরপুরুষ ট্যাক্সি ড্রাইভারের সিগন্যাল ভাঙার পটুতা এবং অলিম্পিকে স্বর্ণপদক পাওয়ার মত দৌড়েও শেষ রক্ষা হল না। ট্রেনের শেষ কামরাটা প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার আগে একটা ব্যঙ্গের হুইসেল বাজিয়ে গেল। যাইহোক কি আর করার। যে যাবার সে তো যাবেই, তাকে ধরে রাখা যায় না। সুতরাং আমার জীবনের আরও একটা রাত প্ল্যাটফর্মের বাইরে কাটবে। এইসব পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে আমি বেশ পটু, তবে তার আগে কিছু খাবার ব্যবস্থা করা দরকার।

দুপুরের পর পেটে দানাপানি পড়েনি। পকেট হাতরিয়ে দেখলাম ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে বাকি তিনশো বিয়াল্লিস টাকা। এতো টাকা কি করে এল ? আমি কি কারোর পকেট মারলাম ? সে যাই হোক, আছেই যখন সদ্ব্যবহার করা দরকার।

শিয়ালদা ব্রিজের নীচে একটা চেনা দোকান আছে সারারাত খোলা থাকে। আমায় দেখলে ধার দেয়। মাসের শেষে টিউশনের টাকা কেটে তার পাওনা শোধ করি। আজ যদিও ধারের ব্যাপার নেই।

নির্মলদা-র দোকানে বাইরের একটা বেঞ্চে গরম গরম রুটি-তড়কা নিয়ে বসেছি একটা বারো-তের বছরের মেয়ে এসে হাত পাতল, "বাবু টাকা দে।"

ভিখিরিরা কি আজকাল রাতেও ঘুমায় না ? এই শহরের হলটা কি ? আমি নির্লিপ্ত মুখে খাবারে মন দিয়েছি মেয়েটা শুকনো মুখে আবারো বললো, "বাবু টাকা দে।" এমনসময় পিছন থেকে একটা অসভ্য চেহারার লোক এসে বলল, "আমার সাথে চল অনেক টাকা দেব, আর কখনও ভিক্ষা করতে হবে না।" কলকাতা শহরের সমস্ত ভিখারি কন্যাই কি এদের সাথে যাবে বলে জন্মেছে ?

লোকটাকে অগ্রাহ্য করে মুখ তুলে বললুম, "এত রাতে টাকা নিয়ে করবি কি ?"

– বাড়ি যাব।

– কোথায় বাড়ি তোর ?

– ওদিকে।

কোনদিকে যে দেখাল বোঝা গেল না। আমার সামনে অপেক্ষারত একটা বিরক্তিকর রাত। প্ল্যাটফর্মের থেকে নিশ্চয়ই ওদের ঘরে মশা কম। বললুম, "বোস"। তবু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। আমি লোকটাকে ইঙ্গিত করে বললাম,

"ও আমার সাথে যাবে তুমি এসো।" কি বুঝলো জানিনা লোকটা একটা কুৎসিত হাসি দিয়ে বিদায় নিল। মেয়েটা তখনো বসে নি। ধমক দিয়ে বললুম, "বোস।"

কাঁদো কাঁদো মুখে আমার বেঞ্চের সামনেটায় বসল। বুঝলাম ভিক্ষাবৃত্তিতে এখনও হাত পাকেনি বেচারির। নির্মলদাকে আর এক প্লেট রুটি তড়কার অর্ডার দিয়ে জমিয়ে বসলাম।

– কি নাম তোর ?

– বিহান।

– বেশ নাম তো। 'বিহান' মানে জানিস ?

– না।

– বিহান মানে সকাল।

দুজনে রুটি তড়কা সাবাড় করে রাস্তায় নামলাম। আজও নির্মলদাকে টাকা দিই নি। কেন জানিনা মনে হচ্ছে আজ রাতটা অন্যরকম হতে চলছে। রাতের শহরটা দিনের মানুষদের কাছে অচেনা হয়ে ওঠে। আমি কিন্তু একে হাড়েহাড়ে চিনি। এমন অনেক রাতের সাথে ওর আমার নাড়ির টান।

– এখন টাকা কি করবি ?

– ওষুধ কিনব।

– কার ?

– মা-র যে অসুখ।

– কি হয়েছে ?

– জানি না।

– কি জানিস তুই ? চল তোর ঘর যাই।

কোলে মার্কেটের এক কোণায় একটা ঠেলা গাড়ীর আড়ালে বিহানদের অস্থায়ি ঘর। মাথার ওপর ছেঁড়া প্লাস্টিক টাঙানো আর নিচে রাজ্যের নোংরা-র মাঝে শয্যা-র ব্যবস্থা। দিনের ব্যস্ততায় এখানে ওদের ঠাঁই নেই। রাতের নিদ্রাটুকুর জন্য এই ব্যবস্থা।

বিহানের হাত ধরে গিয়ে দেখলাম একটি বছর পয়ত্রিশের হতদরিদ্র মহিলা একটা শতছিন্ন কাঁথা গায়ে দিয়ে অচেতন হয়ে পরে রয়েচে। কাছে গিয়ে দেখা গেল শ্বাস চলছে তবে ধুম জ্বর।

– তোর বাপ কই ?

– নেশা খাচ্ছে।

এ ব্যাপারে আমার একটা বিস্বস্ত সাগরেদ রয়েচে। মনু ভাই। পাতাখোর দের ওস্তাদ। মনু ভাইয়ের ঠেকে গিয়ে সব বলতে সে বলল, "কিছু চিন্তা করবেন না ভাই কাজ হয়ে যাবে। আপনি বসুন। আমি এই গেলুম আর এই এলুম।" মনু

ভাইয়ের বৌ গোলাপি আমায় বেশ খাতির টাতির করে। স্টিলের গ্লাসে এক গ্লাস চা কয়েকটা খাস্তা বিস্কুট আর একটা সিগারেট এনে দিল আমায়। বিস্কুট গুলো বিহানকে দিয়ে চা শেষ করার আগেই মনু যে লোকটাকে নিয়ে ঢুকলো তার বয়স আন্দাজ করা কঠিন। পয়তাল্লিশও হতে পারে পঞ্চান্নও হতে পারে। চোখ লাল, শিরদাড়া বেঁকে গেছে, পরনে ছেঁড়া গেঞ্জি আর লুঙ্গি। দেখেই বোঝা যায় পাতাখোর। মনু ভাই সপাটে এক চড় কষালো লোকটার গালে। কি হয়েছে বুঝে ওঠার আগেই আমি আর মনু ভাই হিরহির করে টানতে টানতে নিয়ে চললাম ওকে।

কাসেম মিঞা। বিহানের বাবা। দিনে মোট বয় রাতে সেই টাকায় নেশা করে বৌ আর মেয়েকে পেটায়। বিহানের বাড়ি গিয়ে দেখা গেল অবস্থা আগের মতোই। ডাক্তার ডাকা ছাড়া উপায় নেই। গোলাপিকে আর বিহানকে রেখে আমরা বেরোলাম রাস্তায়। এত রাতে ডাক্তার পাব কোথায়? আর কলকাতার ডাক্তারবাবুরা এই অসময়ে ফুটপাতে রোগী দেখবেন কিনা জানা নেই। কাছেই একটা ওষুধ দোকানের লোককে ডেকে আনা হল। লোকটা নাড়ি দেখে জানাল রাতটুকু থাকবে।

রাতের ভরসা করা গেল না। একটা ট্যাক্সি ডেকে আর.জি.কর নিয়ে যাওয়া হল। ড্রাইভার মনু ভাইয়ের চেনা লোক। টাকার কথা বলতে দাঁত বের করে বলল, "মানুষটা সুস্থ হয়ে গেলে সেটাই আমার বকশিস বাবু।" সত্যি এই শহরের মানুষগুলো আজও তাহলে ব্যবসার থেকে বিপদকে বেশি প্রাধান্য দেয় !

মনু ভাই নাম সই করতে পারে না। ফর্মে আমাকেই সই করতে হল। ডাক্তারবাবু সব দেখে শুনে বললেন, "স্যালাইন, ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে কাল দুপুরের আগে কিছু বলা যাবে না।" বাইরে আসতেই কাসেম আমার পা জড়িয়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো। মনু আর একটা চড় কষাতে যাচ্ছিল আমিই নিরস্ত করলাম। কাসেমকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে বিহানকে ওর হাতে দিলাম। চোখ মুছে কাসেম বললো, "এই মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করছি বাবু আর নেশা করবো না।"

পুব দিক ফর্সা হয়েছে, রাতের শহর আবারো ধীরে ধীরে গা ঢাকা দিচ্ছে দিনের আলোময় ব্যস্ততায়। পকেটের তিনশো বিয়াল্লিস টাকা আর ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপ্সন কাসেমের হাতে দিয়ে বিহানকে নিয়ে রাস্তায় বেরোলাম। কাসেমকে টাকা দিতে মনু ভাই আপত্তি করেছিল, আমি বললাম – দেখিই না ওর দিব্যির দৌড় কত।

আজকের প্ল্যান বিহানকে নিয়ে শহর দেখা। পকেট শূন্য। টাকা অবশ্য কোন ব্যাপার না। নির্মল দা-র থেকে পাঁচশো টাকা ধার করে বের হলাম। ভিক্টরিয়া দেখে বিহান বলল, "এতো বড় বাড়িতে কে থাকে রে কাকা ?" এই প্রথম বিহান আমাকে "কাকা" সম্বোধন করল। কেউ শেখায়নি ওকে একেবারে নিজে থেকে।

এইসব মুহূর্ত সামলানোর ক্ষমতা এই শহরে একমাত্র একজনের আছে। শিল্পি। একটা ট্যাক্সি নিয়ে রাজারহাটে ওর ফ্ল্যাটে গেলাম। দারোয়ান আমাকে চেনে তবে বিহানের দিকে আড়চোখে চেয়ে রইল। শিল্পি-দের এই ফ্ল্যাটটা বেশিরভাগ ফাঁকাই থাকে। ওদের আসল বাড়ি রিষড়ায়। শনি-রবিবার ও মাঝে মাঝে এসে সব দেখেশুনে যায়। সেই সুযোগে আমিও আসি। সেদিক থেকে আমি বেশ ভাগ্যবান।

– জানি তুমি একা আসবে না। কাউকে না কাউকে সঙ্গে আনবেই। এসেই কোন না কোন গল্প শোনাবে আর যত ঝক্কি আমাকে পোহাতে হবে। আচ্ছা বলোতো শেষ কবে আমাকে সময় দিয়েছ ?

– শিল্পি শোনো তো ...

– কি শুনবো ? কোথাকার একটা কে ...

হঠাৎ করে দেখি বিহান গিয়ে শিল্পিকে জড়িয়ে ধরেছে। ব্যাস, আমার দায়িত্ব শেষ এবার যা করার শিল্পি-ই করবে। আমি কেটে পড়ার সুযোগ খুঁজছি শিল্পি এসে রাস্তা আটকাল।

– জানো, দারোয়ান কেন এখনো তোমায় ঢুকতে দেয় ?

– না।

– কারণটা আমিও জানি না। তবে বেশিদিন যাতে ঢুকতে না দেয় সেই ব্যবস্থাই করবো। এই শেষ। কখন ফিরবে শুনি ?

– হাসপাতালে ওর মায়ের একটা খোঁজ নেব তারপর আর দু একটা কাজ আছে সেরেই ফিরব।

– ঘটনা কি ?

সব শুনে শিল্পি বললো, "থাক তোমার মুরোদ আমার জানা আছে, ওকে আমি রুমে নিয়ে যাচ্ছি আর তুমি সকালের পান্তা আছে খেয়ে আমায় উদ্ধার কর।"

আমি এখন নিশ্চিন্ত। শিল্পি-র বাইরেটাই কঠিন। আসলে মনটা খুব সরল। অনেকদিন আসবো আসবো করে আসিনি তাই একটু অভিমান করেছে। আধ ঘণ্টা পর শিল্পি এলো বিহানকে সঙ্গে নিয়ে। এ অন্য বিহান। স্নান করে পরিপাটি করে চুল আঁচরানো, পরীদের মত লাল রঙের একটা জামা পড়েছে, মাথায় হেয়ার ব্যান্ড। মনে মনে আশ্চর্য হলেও মুখে ঔদাসিন্য রেখে বললাম – যার তার জন্য এতো দরদ কি ভালো শিল্পি ?

– আবার যদি ওই কথা বলেছ এক চড় খাবে।

– বাহ! এ যে দেখি উল্টো পুরাণ।

– বাপিকে ফোন করে নার্সিংহোমে ব্যবস্থা করেছি এক্ষুনি শিফট করতে হবে, চলো ...

পথের মানুষদের জন্ম-মৃত্যুর জন্য পথই ভরসা। বড়জোর সরকারি হাসপাতাল। কিন্তু একেবারে কলকাতার নামজাদা নার্সিংহোম ! এ ব্যাপারটা একমাত্র শিল্পি-ই ঘটাতে পারে জানি। বললাম, "একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ?"

– সেটা তোমাকে ভাবতে হবে না।

সেদিন বিকেলের মধ্যেই বিহানের মা কে ভর্তি করা হল শহরের একটি বিখ্যাত নার্সিংহোমে। তিনদিনের মাথায় মহিলা একেবারে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। এই তিনদিন আমাদের বেশ ভালই কেটেছে। রাজারহাটের আলিসান নিউ মারলিনে আমি, শিল্পি আর বিহান। বিহান শিল্পি-কে পেয়ে একরকম আমায় ভুলেই গেছে। রান্নাবান্না তিনজনে মিলে একসাথে করি। সে এক হৈ হৈ ব্যাপার। রাতেও সে শিল্পি-কে ছাড়তে চায় না। কোনওরকমে বিহানকে ঘুম পাড়িয়ে শিল্পি আমার কাছে আসে। তারপর আমরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। সুদূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। তারপর পরস্পর পরস্পরের প্রতি ডুবে যাই। এভাবেই রাত কেটে ভোর হয়।

তিনদিন পর বিহানের মা-র ছুটি হল। শিল্পিদের ফ্ল্যাটবাড়িটা দেখাশোনা, কাজের জন্য একজন কাউকে দরকার। শিল্পি ওর বাবাকে বলে বিহানের মা কে নিযুক্ত করল। বিহান আর শিল্পি-র দাদার ছেলে রেহান একসাথে স্কুলে যায়। রেহান দু বছরের বড়। ওদের বেশ ভাব হয়েছে। কাসেম এখনো মোট বয় তবে সত্যিই আর নেশা করে না। কে বলে মানুষ পরিবর্তন হয় না? ইচ্ছাটাই সব। সেই ইচ্ছাশক্তি কাসেম মিঞার ছিল।

ওদের আর আমাকে প্রয়োজন নেই। আবার পুরনো জীবনে ফিরে গিয়েছি আমি। পথ আমার প্রাসাদ। আবার নতুন কোন গল্পের খোঁজে পথে নেমেছি আমি। একবার বিহানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম – বড় হয়ে কি হতে চাস ? উত্তরে বলেছিল,

"ডাক্তার"। ওর মায়ের মত অসহায়াদের চিকিৎসা করার প্রেরণা বোধহয় ওর ক্ষুদ্র মনে ঢুকে গেছে। বিহানকে যে ডাক্তার বানাতে পারে সে আমি নয়, সে শিল্পি। আমি শুধু পারি বিহানদের প্রকৃত শিল্পীদের কাছে পৌছে দিতে। আমি সত্যকিঙ্কর। কোন বন্ধনে নিজেকে না জড়িয়ে বিহান-দের ছেড়ে শিল্পি-দের ছেড়ে অন্তহিনে পাড়ি দেওয়াই আমার জীবনের ব্রত। তাই বহুকাল হল ওদের কাছে আর যাই না।

* আমার প্রাণের শহরের প্রত্যেক বিহানের জন্য।

মনীষা রায়

বিবাহ তখন-এখন

তুলিকা সেন যখন চার বছর ছেলের কাছে আমেরিকায় কাটিয়ে সরাসরি মুম্বাইতে মেয়ের বাড়ি গিয়ে উঠলেন তখন আত্মীয় পরিজন একটু অবাক হলেও তেমন কিছু সন্দেহ করেনি। তারপর আরও দু'বছর কেটে গেল তবু তিনি কলকাতায় নিজের বাড়ি ফিরলেন না। এবারে শুধু আত্মীয় পরিজন নয় পাড়া প্রতিবেশীরাও প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেছে। কেউ অবশ্য সরাসরি তাঁর স্বামী অমর সেনকে জিজ্ঞেস করেনি। জনসাধারণ তাদের সিকথ্ সেন্সের ক্ষমতাবলে অনেক রকম মতামত কেবল পোষণ করল না, ছড়াতেও আরম্ভ করল, যেমন — আমেরিকায় থাকাকালীন তুলিকা সেনের দুরারোগ্য ক্যানসার ধরা পড়েছে, তাই মুম্বাইতে মেয়ের কাছে থেকে চিকিৎসা করাচ্ছেন, কলকাতার কাউকে জানাতে চান না। অথবা, মেয়ের বিয়েতে গোলমাল চলছে, তাই আপাততঃ মেয়ের কাছেই থাকবেন।

কলকাতায় তাঁর বাড়িতে সবার সঙ্গে বসে চা খেতে খেতে এক বৃদ্ধা পিসশাশুড়ি বললেন, 'শুনেছি আমেরিকা যাবার পর আমাদের বউমা নাকি প্যান্ট কোট পরে একেবারে মেমসাহেব হয়ে গেছে। তাই মুম্বাইতে থাকবে ঠিক করেছে। কলকাতায় তো ষাট বছরের মহিলার কোট প্যান্ট পরে রাস্তায় বেরোনোটা এখনও তেমন চালু হয়নি।'

'কেন, কত মহিলা তো আজকাল জীনস্ আর টপ্ পরে মলে যাচ্ছে উইন্ডো সপিং করতে।' এক কম বয়সি বলে উঠল।

'কী যে বলিস তোরা ! একান্নবর্তী পরিবারে চল্লিশ বছর বিয়ের পর শ্বশুর ভাসুরদের সামনে গট্ গট্ করে সুট বুট পরে বেরোতে পারে ? হাজার হোক আমরা দু-এক জন শাশুড়ি তো এখনও বেঁচে আছি। সেরকম সাহস হবে না।' বলে পিসশাশুড়ি হিটলারের ঢঙে মাথা দুলিয়ে টান হয়ে বসে রুপোর পানের বাটা থেকে এক খিলি পান বের করে মুখে ঢোকালেন। এই 'লাস্ট ওয়র্ডের' পর আর কেউ কিছু বলার সাহস পেল না। নতুন বিয়ে-করা অ্যাটর্নি নাত-বউ নেহা বলতে যাচ্ছিল, — কেউ কি সরাসরি তুলি কাকিমাকে জিজ্ঞেস করেছে কেন উনি কলকাতা ফিরছেন না ? কিন্তু সম্পর্কে ও বয়সে বড় আত্মীয় পরিজনের পরচর্চার আনন্দে নাক গলাতে সাহস পেল না। যদিও তার মনে বেশ কিছু প্রশ্ন থেকে গেল।

রাত্রে শোবার ঘরে চার বছর ধরে প্রেম করে বিয়ে-করা স্বামী প্রসেনজিৎ ওরফে জিৎ-কে নেহা জিজ্ঞেস করল, ''আচ্ছা, তুমি কি তোমাদের তুলি কাকিমাকে ভাল করে চেন ?' 'কেন বল তো ? হ্যাঁ চিনি বৈকি, তবে ঘনিষ্ঠ ভাবে নয়। ছুটি ছাটায় পরিবারের সবাই একত্র হলে দেখা হয়েছে। খুব মিশুকে আর স্পষ্টবাদী মানুষ। তাছাড়া যথেষ্ট আধুনিক। অমর কাকার চাকুরি উপলক্ষে নানা জায়গায় ঘুরেছেন। আমাদের সব মা-কাকিমাদের মধ্যে তুলি কাকিমারই একমাত্র এম এ ডিগ্রি আছে। এক সময় লক্ষ্ণৌ না কোথায় একটা কলেজেও পড়িয়েছেন।'

'না, মানে সেদিন পিসি দিদার বাড়ি গিয়েছিলাম ওর নাতিনি সৃঞ্জনীর সঙ্গে দেখা করতে। দুতলার বারান্দায় চায়ের আসর বসেছিল, উনিই বলছিলেন তুলি কাকিমা নাকি কলকাতা ফিরছেন না প্যান্ট শার্ট পরতে পারবেন না বলে। আমার এটা বিশ্বাস হয় না। তোমার কী মনে হয় ?'

'দুর, দুর। আসলে হয়তো অন্য কিছু কারণ আছে যা সবার জানার কথা নয়। তাছাড়া হয়তো কিছুদিনের জন্য কলকাতা থেকে একটু ব্রেক নিচ্ছেন। আমি তো কালকাতার বাইরে যেতে পারলে লাফিয়ে উঠি।'

'কলকাতা থেকে ব্রেক না অন্য কিছু থেকে ?'

‘অর্থাৎ ?’ বলে ম্যানেজমেন্টের উঁচু ডিগ্রি ধারী স্বামী দু-চোখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকাল। ‘আমি এখনও কিছু বলতে চাই না। একটু এভিডেনস্ হাতে এলেই রায় দিতে পারব ?’ স্ত্রীর লিগেল মস্তিষ্কে এখন অন্য কথা ঘুরছে বুঝতে পেরে প্রসেনজিৎ আজ রাত্রে কিছু ম্যানেজ করার আশা ছেড়ে দিয়ে বেডসাইড টেবিলে রাখা ওয়াল স্ট্রিট জার্ন্যালটার পাতা উলটোতে লাগল।

রবিবার যথারীতি নেহা যোধপুর পার্কে তার বাপের বাড়ি গেছে বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে। একথা সেকথার পর তার মাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল,

‘মা একটা কথার উত্তর দেবে ? আমার বান্ধবীরা কেউ তাদের মাকে এসব কথা বলতে সাহস পায় না। আমি ওদের গর্ব করে বললাম, আমার মার সঙ্গে আমি সব কথা বলতে পারি। সো, ডোন্ট লেট মি ডাউন, ওকে ?’

‘তোর প্রশ্নটা আগে শুনি, তারপর বুঝব আমি উত্তর দিতে পারব কি পারব না।’ মা হেসে বললেন। একমাত্র মেয়ের আবদার মায়ের পক্ষে অবহেলা করা কঠিন। নেহা একটু ইতস্তত করে বলল, ‘ওকে তোমার আর বাবার তো তিরিশ বছরের ওপর বিয়ে হয়েছে। এই তিরিশ বছরের মধ্যে তোমার বা বাবার কি কখনও অন্য কারও প্রতি আকর্ষণ হয়েছে ? ইউ নো হোয়াট আই মীন।’ মা একটু অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন রে ? তোর আর জিতের মধ্যে কোনও — ?’ নেহা অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, আরে না না। ওসব কিছু না। তোমাদের সময়কার বিয়েতে এসব হত কিনা তাই জানতে চাইছিলাম। বলতে না চাও ঠিক আছে।’ মেয়ের গলায় অভিমান শুনতে পেয়ে মা হেসে বললেন, ‘আঃ হা, রাগ করিস কেন। আসলে আমাদের সময় বিয়ে হবার পর এ ধরনের চিন্তা বা আলোচনার রেওয়াজই ছিল না। যদি বিয়ের আগে কারও প্রতি একটু আধটু আকর্ষণ থেকেও থাকে, বিয়ের পর এসব ভাবার সাহস আমাদের ছিল না। তাছাড়া স্বামীর ও সংসারে প্রতি কর্তব্যটাই ছিল আমাদের ভালবাসা। একজন চরিত্রবান, রোজগেরে আর ভদ্র স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হলেই আমরা বর্তে যেতাম। তার মানে এই নয় যে গল্প উপন্যাসে প্রেমের কথা পড়ে হৃদয় উতলা হয়নি কখনও কখনও। কী রে, হাসছিস যে ?’ নেহা হাসতে হাসতে মাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে বলল,

‘থ্যাংস্ মা। থ্যাংস ফর ইওর অনেস্টি। আমি আমার উত্তর পেয়ে গেছি। অন্তত মেয়েদের দিকটা বোঝা গেল। তবে তোমাদের সময়কার সব বিয়েই কি এক ? নিশ্চয় কোনও কোনও বিয়ে সুখের হয় নি। মহিলারা হয়তো মুখ বুজে অনেক কিছু সহ্য করেছেন যেহেতু আর কোনও উপায় ছিল না। ডিভোর্স বিল তো পাশ হয়েছে মাত্র ফিফ্‌টিজ-এ।’

‘ঠিক। ডিভোর্স শব্দটাই কেউ শোনে নি তখন। অশান্তি হলেও মেয়েরা মানিয়ে নিত নিজেদের পরিবারের মান সম্মানের কথা ভেবে। তাছাড়া স্বামীর ঘর ছেড়ে গেলে যাবার জায়গা ছিল একটাই — বাপের বাড়ি। কোনও মেয়ে পারতপক্ষে বিয়ের পর বাপের বাড়ি ফিরে যাবার কথা ভাবতে পারত না, যদি না মারাত্মক কিছু সমস্যা হত। যেমন, স্বামী পাগল অথবা শ্বশুর বাড়ির সবাই মেয়েটির ওপর শারীরিক অত্যাচার করছে। অবশ্য বউ পাগল বা বন্ধ্যা হলে স্বামী তাকে ত্যাগ করে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে, এমন ঘটনা ঘটত বৈকি।’

‘সত্যি, আমরা মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে কতটা এগিয়ে গেছি। এখন কোনও মেয়ে অত্যাচার সহ্য করে স্বামীর সঙ্গে থাকতে বাধ্য নয়, তার চয়েস আছে।’ নেহা মার দিকে তাকিয়ে বলল। ‘কী জানি! তোদের চয়েস আছে ঠিক, তবে তাতে কি সুখ-শান্তি বেড়েছে ? চয়েসের সঙ্গে সঙ্গে দায় দায়িত্ব তো বাড়ে, তাই না ?’

‘মা, ইউ আর সো ওয়াইজ।’

মাসখানেক পেরিয়ে যাবার পর একদিন শোবার ঘরে নেহা তার নাইটির ওপর একটা হালকা সিল্কের হাউসকোট পরে দুটো ছোট গেলাসে বিদেশ থেকে আনা এক বন্ধুর উপহার- ফরাসি ব্র্যান্ডি ঢেলে জিৎ- কে ডাকল,

‘এই যে তোমার নাইট ক্যাপ।’ নিজের গেলাস হাতে নিয়ে জিতের পাশের চেয়ারটায় বসে পা দুটি বিছানার ওপর তুলে আরাম করে বসল। জিৎ অপেক্ষা করছে স্ত্রীর ওপেনিং লাইনের জন্য। ‘তোমার মনে আছে আমি তুলি কাকিমার কলকাতা না ফেরার কারণ খুঁজছিলাম?’ মনে না থাকলেও জিৎ বলল, ‘খুব মনে আছে। তা, নতুন কিছু জানতে পারলে?’

‘সাবস্টেনশিয়াল নয় তবে সারকমস্ট্যান্সিয়াল কিছু প্রমাণ বা কারণ মাথায় এসেছে। সেদিন একটা কেস নিয়ে আমার এক কলিগের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ও ডিভোর্স অ্যাটর্নি ও একটা কথা বলল যার সারমর্ম হচ্ছে এই।’ ব্র্যান্ডির গেলাসে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল নেহা, আমাদের দেশে গত দশ বছরের ডিভোর্স স্ট্যাটিস্টিক্স-এ নাকি শতকরা নব্বই ভাগ ডিভোর্সির বয়স পঞ্চাশের নিচে, অর্থাৎ আমাদের মা-বাবাদের জেনারেশনের কেউই হয়তো লিগেল ডিভোর্স-এর পথে যান নি। আমার মাও সেদিন একই কথা বলছিল। তার মানেটা বুঝতে পারছ তো?’

‘হ্যাঁ, যা বললে সেটা বুঝতে রকেট সায়ন্টিস্টের দরকার হয় না। শতকরা নব্বই . . .’ নেহা তার স্বামীর কথা শেষ করতে দিল না, একটু বিরক্ত হয়েই বলল, ‘ইম্প্লিকেশনটা এখনও ধরতে পারলে না? বলে বোতল থেকে আরেকটু ব্র্যান্ডি ঢালতে গিয়ে নেহার হাত থেকে কিছুটা ব্র্যান্ডি বিছানায় পড়ে গেল।

‘আহা হা, কর কী? এত দামি জিনিস, একটু সাবধান হলে ক্ষতি আছে?’ বলে জিৎ তার শূন্য গেলাস স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিল। নেহা ছিপি বন্ধ করে বোতল রেখে দিয়ে বলল,

‘দামি জিনিসটা তো আমার বন্ধুর উপহার। আমি কী করি না করি সেটা আমার ডিসিশন্।’ ‘তপন আবার কবে তোমার বন্ধু হল? বিয়ের বছর খানেক আগে আমিই তো আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের। তপন বিয়েতে আসতে পারনি তাই যখন দেশে এল পরের মাসে, সে তাজ বাংলায় আমাদের নেমন্তন্ন করেছিল, হাতে ছিল এই ব্র্যান্ডির বোতলের গিফট্ প্যাকেট।’ ‘দ্যাটস্ রাইট। তুমি কি একবারও ভেবে দেখেছিলে, কেন তপন এক মাস আগে আসতে পারল না। যে নাকি এত দিনের বন্ধু সে বিয়েতে না এসে একমাস পর আসে! কী, মাথায় কিছু আসছে?’ নেহার গলায় রীতিমত উষ্মা। চোখে ঝিলিক দিচ্ছে এক হিংস্র বন্যতা। ও নিজেও জানে এই মুহূর্তে পিছোতে না পারলে এমন কিছু বলে ফেলবে যা আর ফেরানো যাবে না। তপনের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথাটা প্রসেনজিতের অজানা। বিয়ের আগের সম্পর্ক নিয়ে নেহা প্রসেনজিৎ-কে কিছু বলার দরকার ছিল ভাবেনি। আসলে তপনকেই নেহার বেশি পছন্দ ছিল। কিন্তু প্রসেনজিতের উদ্দম অটল সংকল্পের কাছে তপন হেরে গেল। নেহার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে প্রসেনজিৎ হুট করে বলে উঠল, ‘যাক গে ওসব কথা। তুমি আমাকে বলতে যাচ্ছিলে তুলি কাকিমাদের বিয়ের ব্যাপারে কিছু।’ তর্কাতর্কির এই দিক পরিবর্তনটা নেহার পছন্দ না হলেও ও জিতের কাছে কৃত’ না হয়ে পারল না। আর একটু হলেই একটা পুরোনো সিক্রেট ফাঁস হয়ে বিপদ ঘটাত। তার মাত্র দু-বছরের বিয়েতে নেহা সন্দেহ ঢোকাতে চায় না — কিছুটা ব্র্যান্ডি ঢেলে দিল জিতের গেলাসে। নিজেরটা শেষ করে আরও নিল, তারপর বলল, ‘আমার মনে হয় তুলি কাকিমার আমেরিকায় হয়তো কারও সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যাকে ভাল লেগেছে, কিন্তু এই বয়সে এতদিন বিয়ের পর কাকাবাবুকে হঠাৎ এসব কথা জানাতে চান না, তাই দূরে রয়েছেন একটা ডিসিশন নেবার আগে হয়ত ভাবছেন . . .’’ নেহার কথা শেষ করতে দেবার ধৈর্য রইল না জিতের। ও প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,

‘তোমার মাথাটা গেছে: না কি দু-গেলাস ব্র্যান্ডি গিলে যা খুশি তাই বলছ। কই, তোমার এই কনক্লুশনের এভিডেন্স কোথায় দেখাও দেখি?’

‘সবসময় এভিডেনসের দরকার হয় না। ইন্ট্যুইশন্ থাকলে অনেক কিছুই সারমাইজ করা যেতে পারে। বলেছ, তুলি কাকিমা শিক্ষিত ও আধুনিক, অনেক জায়গায় থেকেছেন, ইন আদার ওয়ার্ডস, যথেষ্ট স্বাধীন মহিলা। তাঁর পক্ষে দু-বছর বিদেশে কাটিয়ে কারও প্রেমে পড়াটা একেবার অসম্ভব বলছ?’

‘এটাই তোমাদের মেয়েদের বেসিক প্রবলেম। তোমরা ঝোপে ঝারে প্রেম দ্যাখ। প্রমাণ ছাড়া এই জাতীয় কনক্লুশনে তুমি অন্তত পৌঁছোবে ভাবতে পারি নি। তুমি না হট্ শট্ অ্যাটর্নি — যুক্তি ছাড়া সারমাইজের মধ্যে তুমি নেই বলে আমায় কত লেকচার দিয়েছ, মনে আছে?’

‘আরে বাবা, বলছি তো সব মানুষের পক্ষেই সব কিছু সম্ভব। তাছাড়া কার ও প্রতি আশক্ত হওয়া বা কাউকে হঠাৎ ভালবাসা কি এতই একটা অসম্ভব ব্যাপার? তোমার নিজের কথা মনে নেই? পুরো চারটে বছর আমার পেছনে ঘুরেছো, যদিও জানতে আমার অনেক অ্যাডমায়ারার ছিল।’ বলে নেহা ডান দিকের ভুরু তুলে মিচ্‌কি হেসে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে জিতের পায়ে একটু ঘষে দিল। জিত সেদিকে মনোনিবেশ না করে বলল,

‘তাই বলে একজন মিড্‌ল-এইজড্ মহিলার পক্ষে এরকম প্রেমে পড়া? একি হলিউড না বলিউড? ইন ফ্যাক্ট, বলিউডে এখনও মিডল্ — এইজড্ মহিলার একস্ট্রাম্যারিট্যাল প্রেম নিয়ে মুভি হয়েছে বলে শুনিনি। আমাকে বলেছ ঠিক আছে, আর কাউকে এসব বলতে যেও না।’

‘বাপরে! এ যে দেখছি প্যাট্রিয়ার্কির ব্যানার নিয়ে বেরিয়েছ। কেন একজন বয়স্কা মহিলার কি হৃদয় নেই? স্বামীর সঙ্গে অনেকদিন ঘর করার পর যদি বনিবনা না হয় অথবা বোরডম্ এসে যায় তাহলে অন্য কাউকে ভালবাসাটা কি ক্রাইম? এটা টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি। কোথায় পড়ে আছ জিৎ? চোখ খুলে তাকাও চারদিকে।’ নেহা রেগে মেগে বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমের দিকে গেল। অল্পক্ষণ আগের প্রেম প্রেম ভাবটা সম্পূর্ণ উবে গেছে দেখে প্রসেনজিৎ কী করবে ভেবে পেল না।

পরে বিছানায় শুয়ে প্রসেনজিৎ চেষ্টা করেছিল নেহাকে জড়িয়ে ধরতে, কিন্তু নেহা সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে যতটা পারে জিতের ছোঁয়া বাঁচিয়ে ঘুমের ভান করতে লাগল। জিৎ শব্দ করে বিছানা ছেড়ে উঠে বসার ঘরে টিভি খুলে বসল। প্রথম সন্ধ্যার ব্র্যান্ডির মৌজ অনেকক্ষণ হল

পালিয়েছে। একটু বিরক্ত হয়েই প্রসেনজিৎ ভাবতে লাগল —

কেন যে মেয়েরা এক কথা থেকে আরেক কথায় চলে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুডের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। জেনারেল টপিক নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই এরা স্পেসিফিকে চলে যায়। নেহার মতো ব্রিলিয়ান্ট মেয়েও যদি এরকম ইর‍্যাশন্যাল হয়, তাহলে তো মহা মুস্কিল। তাহলে কি মেয়েদের মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের কোন ও তফাৎ নেই। উইম্যান লিবের কচকচানির সঙ্গে পরিচিত আত্মীয় স্বজনের ব্যবহারের কী সম্পর্ক? সবকিছুতেই কি আমেরিকানদের নকল করতে হবে? তাছাড়া কিছু না জেনে শুনে হঠাৎ তুলি কাকিমা চল্লিশ বছরের স্বামীকে ফেলে আরেকজনের প্রেমে পড়েছেন এমন একটা বদনাম দেওয়াটা তো রীতিমত বোকামি, আনফেয়ার অ্যান্ড ড্যাঞ্জেরাস। তাহলে কি অল্প দিন বিয়ের পর এই সম্ভাবনাটা বেশি?

এই চিন্তাটার ভেতর যে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা আছে সেটা আন্দাজ করে প্রসেনজিৎ তাড়াতাড়ি টিভির চ্যানেল সার্ফ করতে লাগল। কিন্তু কোনও লেট-নাইট মুভিতে মন বসল না। তাহলে কি নেহার পক্ষে সহজেই অন্য কাউকে ভালোবাসা সম্ভব? না না, সেটা কী করে হয়? স্তবকদের লম্বা লাইন থেকে নেহা তো প্রসেনজিৎ-কেই বেছে নিয়েছিল। চার বছর ধরে প্রেম করে এই বিয়ে। নেহার পরিবার খ্রিষ্টান বলে মায়ের অমত ছিল, যদিও বাবার এই জাতীয় প্রেজুডিস নেই। উপরন্তু নেহার সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়ে বাবা বলেছিলেন ‘এই মেয়ে লাখে একটা। তোর মাকে আমি বোঝাবোখন। চিন্তা করিস না।’ এডিনবরায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছেন বলেই হয়তো বাবা ঐসব পুরোনো সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। বাবার সমর্থন পেয়ে প্রসেনজিৎ আর কোনও বাধা-বিঘ্নের তোয়াক্কা করেনি।

মা শেষ পর্যন্ত মত দিতে বাধ্য হলেও নেহাকে বিয়ের দুবছর পরও ঠিক অ্যাক্সেপ্ট করতে পারেন নি। জিতরা এক বছর বাবা-মার সঙ্গে কাটিয়ে লোয়ার সারকুলার রোডের একটা হাইরাইজ বিল্ডিং-এর এগারো তলায় উঠে এসেছে। আলাদা থাকায় মায়ের সঙ্গে নেহার সম্পর্কটাও ভদ্র। জিৎ অবশ্য অফিস-ফেরৎ মাঝে মাঝে সল্টলেকের মার কাছে ঘুরে আসে।

কখনও কখন ও মা জোর করে খাইয়ে দেন। নেহা এসব নিয়ে কখনও কথা তোলে নি। প্রসেনজিৎ অবশ্য ওর আধুনিক বউ এর কাছে এই রকম ব্যবহারই আশা করে।

টিভিটা অফ্ করে প্রসেনজিৎ সোফার ওপর শুয়ে পড়ল। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু এয়ারকন্ডিশনারের একটানা মৃদু আওয়াজ। শোবার ঘর থেকে কোনও সারা শব্দ শোনা যাচ্ছে না। নেহা নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে — বলছিল ওর খুব সকালে কোর্টে একটা কেস আছে। বেচারা ! খুব খাটে ও ক্লায়েন্টদের জন্য। স্ত্রীর কেরিয়ার-সাফল্যে জিতের গর্বের অভাব নেই। কিন্তু কোথায় যেন একটা কিছুর অভাব বোধ করছে আজকাল। নেহা সর্বদা একটা ব্যস্ততার কবলে বাস করে। বিয়ের আগে যেমন প্রসেনজিৎ নেহার ক্ষুরধার বুদ্ধি ও তর্ক করার ক্ষমতাকে বাহবা দিত — বন্ধুমহলে বুক উঁচু করে হাঁটত — এখন বিয়ের দু'বছর পেরোতে না পেরোতেই সেই একই গুণাবলি তাকে কেমন যেন ক্লান্ত করে। বয়স্ক আত্মীয় স্বজনের সামনে কখনও কখনও অপ্রস্তুতও হয়। কিন্তু স্ত্রীকে এই নিয়ে কিছু বলতে সাহস পায় না। অবশ্য নতুন বিয়েতে সবাইকেই অ্যাডজাস্ট করতে হয়। কিন্তু কীসের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে হবে সেটা ঠিক জানে না। এসব ভাবতে ভাবতে প্রসেনজিৎ সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল তখন প্রসেনজিতের ঘাড়ে একটা ব্যথা থেকেই বুঝতে পারল যে ও সারা রাত সোফার হাতলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিল। গায়ের চাদর দেখে বুঝল নেহা খুব সকালে এসে ওকে একটা ঢাকা দিয়ে গেছে। সোফার সামনেই কফি টেবিলের ওপর আফ্রিকান এবনির নগ্ন মেয়ের মূর্তির নিচে রাখা একটা কাগজের চিরকুট চোখে পড়ল। নেহার হাতে লেখা তিন লাইন, 'আমার ফিরতে দেরি হবে। বাইরে ডিনার করে নেব। ডোন্ট ওয়েট ফর মি।' প্রসেনজিৎ লক্ষ্য করল নেহা তার নাম সই করেনি। সাধারণতঃ ওরা এই জাতীয় ছোট চিঠিতে পরস্পরের দেওয়া আদরের নাম ব্যবহার করে। ঘাড়ের ব্যথাটা যেন আরও বেড়ে গেল।

এরপর প্রায় তিন-চার সপ্তাহ কেটে গেছে। প্রসেনজিৎ ও নেহা দুজনেই যার যার কাজ নিয়ে জড়িয়ে পড়ায় আর কোনও কথাবার্তার সুযোগ হয় নি। এক সোমবার ভোরে প্রসেনজিৎকে অফিসের কাজে দিল্লি যেতে হয়েছিল। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় সন্ধ্যার ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা না করে বিকেলের একটা ফ্লাইট নিয়ে কলকাতা ফিরে এল। এয়ারপোর্টের পার্কিং লটে দূর থেকে একজনকে ট্যাক্সির দরজা খুলে ঢুকতে দেখে হঠাৎ মনে হল ওর পুরোনো বন্ধু তপন। ওদের মধ্যে দুরত্বটা প্রায় দু-শ গজ মত হবে। তাই ও পুরোপুরি শিওর হতে পারেনি। তাছাড়া তপন তো জার্মানিতে। তপন প্রিয় বন্ধুকে না জানিয়ে দেশে ফিরবে, তা অসম্ভব। ও একটু দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল লোকটি সত্যি তপন কিনা দেখতে। ততক্ষণে এই ট্যাক্সি স্টার্ট দিয়ে পিছোতে আরম্ভ করেছে। প্রসেনজিৎ একটু সরে নিচু হয়ে গাড়ির ভেতরের লোকটিকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। গাড়িটা ঠিক আস্তে আস্তে পিছোচ্ছে। জিৎ পরিষ্কার দেখতে পেল ট্যাক্সির পেছনের সিটে নেহা দুহাত বাড়িয়ে লোকটিকে আলিঙ্গন করল। যখন তার সম্বিৎ ফিরল ততক্ষণে ট্যাক্সিটা অনেকটা এগিয়ে গেছে।

নিজের গাড়িটা খুঁজে বার করে প্রসেনজিৎ গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগে মোবাইলে নেহাকে ধরার চেষ্টা করল। নেহা ধরল না। ও এখন বেপরোয়া। নেহাকে টেকস্ট করেও যখন উত্তর পেল না, তখন আর উপায়ান্তর না দেখে বাড়ির দিকে গাড়ি চালাল। সারা পথ অনেক ছোটো খাটো কথা আর ঘটনা তার মাথায় ভিড় করে এল। মাস খানেক আগে এক সন্ধ্যায় ওদের শোবার ঘরে ব্র্যান্ডিতে সিপ্ দিতে দিতে তপন কার বন্ধু সে বিষয়ে যে কথা হয়েছিল এখন তার তাৎপর্য একেবারে অন্য রকম দাঁড়াচ্ছে। তাহলে কি তপনের প্রতি নেহার আকর্ষণ এখনও আগের মতোই আছে ? শুধুই আকর্ষণ, না প্রেম ?

প্রসেনজিৎ স্নান সেরে যখন খাবার ঘরের ফ্রিজ খুলে কী খাবার আছে দেখছিল, তখন নেহা বাড়ি ফিরল। হালকা পায়ে স্বামীর কাছাকাছি এসে বলল, 'ওসব পুরোনো খাবার খেতে হবে না। আমি 'মেইনল্যান্ড চায়না' থেকে টেক আউট নিয়ে এসেছি। তোমার ফেভ্রিট ডাক রোস্ট এনেছি।' বলে হেসে ওর দিকে তাকাল যেন গত ক'দিনের ঘটনা একেবারে মুছে গেছে ওর স্মৃতি থেকে। আর আজকের ব্যাপারটা তাহলে কি প্রসেনজিৎ ভুল দেখল ? ও একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'তুমি কি কাল কলকাতার বাইরে কোথাও গিয়েছিলে ? মনে হল এয়ারপোর্টে একটা ট্যাক্সিতে তোমাকে দেখলাম। আগে জানলে রাইড দিতে পারতাম।'

‘তাই নাকি ? তা ডাকলে না কেন ?’

‘আমি শিওর ছিলাম না, মনে হল সঙ্গে এক ভদ্রলোক ছিলেন । বাই দ্য টাইম আমি তোমার ট্যাক্সির কাছে গেছি তখন ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল । কথা বলে প্রথম স্ত্রীর দিকে সরাসরি তাকাল । নেহা তার দৃষ্টি এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলল,

‘ও, ভাল কথা । তপন ফোন করেছিল ল্যান্ড ফোনে । ওর নাকি তোমার বা আমার কারও মোবাইলের নাম্বার হাতের কাছে ছিল না । ও হঠাৎ কলকাতা এসেছে, ওর মায়ের শরীর খারাপ খবর পেয়ে ।’ এর পর যে কোনও কারণেই হোক জিতের সাহস হল না আবার একই প্রশ্ন করতে । নেহার এই সত্যি ও মিথ্যার মাঝামাঝি উত্তরে সে একাধারে চমৎকৃত ও বিরক্ত হয়ে বলল, ‘তাই বুঝি ? বেশ তো, ওকে এখানে আসতে বলেছ ? ও কতদিনের জন্য এসেছে ?’ প্রশ্নগুলো করে নিজেকেই মিথ্যেবাদী মনে হল প্রসেনজিতের ।

‘অত সব জিজ্ঞেস করার সময় পাইনি । তুমি ওদের বাড়িতে ফোন করলেই সব জানতে পারবে ।’ বলে নেহা শোবার ঘরের দিকে গেল জামা কাপড় বদলাতে । প্রসেনজিৎ একটা গেলাসে স্কচ ঢেলে ধুপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল । কয়েক মিনিট পর নেহা একটা হাউস কোট পরে কিনে আনা খাবার মাইক্রোওয়েভে গরম করতে লাগল । খাবারের পর প্রসেনজিৎ ‘অনেক কাজ বাকি’ এই অজুহাতে বাইরের ঘরে রয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ ল্যাপটপে মনোনিবেশ করে শেষ পর্যন্ত আবার সোফাতে ঘুমোল ।

পরদিন সকালে প্রসেনজিতের ঘুম ভাঙতে আবার দেরি হয়েছে । কফি খেতে খেতে সে মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তপনকে ফোন করল । প্রথমেই তপনের মা কেমন আছেন জিজ্ঞেস করে জানতে চাইল তপনের পক্ষে লাঞ্চে আসা সম্ভব কিনা । ঘন্টা দুই পর দুই বন্ধু পার্ক ষ্ট্রিটের একটা রেস্তরাঁর টেবিলে মুখোমুখি বসে । দুটো বিয়ারের অর্ডার দিয়ে একথা সেকথার পর প্রসেনজিৎ সরাসরি বলল, ‘কাল তুই এসেছিস যে খবরটা নেহাকে জানালি অথচ আমায় নয় । কারণটা জানতে পারি কি ?’ ‘নেহা তোকে বলে নি সেটা আমি কী করে জানব ।’ নেহা এবং তপন — দুজনেরই বুকের পাটা দেখে প্রসেনজিৎ অবাক না হয়ে পারল না । অনেক কষ্টে বন্ধুর দিকে না তাকিয়ে বলল, ‘নেহা কেন বলে নি সেটা তুই ভাল করেই জানিস । তোদের ব্যাপারটা কত দিন ধরে চলছে জানতে ইচ্ছা করছে । এককালে তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিলি । এ ধরণের বিট্রেয়ালের শাস্তি কী হওয়া উচিৎ তুইই বল’ । শেষের দিকে প্রসেনজিতের গলা ধরে এল । তপন বিয়ারের গেলাসে চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে বলল,

‘আমাকে জিজ্ঞেস না করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলাটা কি ঠিক হত না ? নেহার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের মধ্যে কোনও কনফ্লিক্ট বা কনফ্যুশন নেই । নেহার মতো মেয়ের পক্ষে একাধিক পুরুষকে ভালোবাসা অসম্ভব নয় ।’

এরপর প্রসেনজিতের পক্ষে আর কথা বলা সম্ভব ছিল না । বিয়ারের গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে পকেট থেকে একটা পাঁচশ টাকার নোট টেবিলে রেখে ও বলল, ‘একটা কাজের কথা মনে পড়ল । আমি চলি ।’

‘এত টাকা কেন ? আমাকে বকশিস দিচ্ছিস নাকি ?’ তপনের কথাটা না শোনার ভান করে শুধু রেস্তরাঁ নয় তার কুড়ি বছরের পুরোনো বন্ধু তপনের জীবন থেকেও বেরিয়ে গেল প্রসেনজিৎ ।

পথে গাড়িটা ঘুরিয়ে স্ট্রান্ড রোডের দিকে চালাতে চালাতে প্রসেনজিৎ লক্ষ্য করল যে তার গলার কাছটা ব্যথা করছে আর চোখ জ্বালা করছে । গাড়ি পার্ক করে বাচ্চা ছেলের মত কেঁদে ফেলল ও । ঠিক বুঝতে পারছে না কষ্টটা স্ত্রীর না বন্ধুর — কার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য । সমস্ত কিছু যেন অর্থহীন লাগছে । এখন তার কী কর্তব্য ভেবে উঠতে পারছে না । নেহাকে ডিভোর্স করাটাই হয়তো উচিৎ, কিন্তু প্রসেনজিতের ভালোবাসা কি এই একটি ঘটনায় মরে যেতে পারে ? নেহাকে ছাড়া সে বাঁচবে কী করে ? বেশীক্ষণ এসব ইমোশন্যাল কথা নিয়ে ভাবা প্রসেনজিতের স্বভাব নয় । একটা টনটনে ব্যথা কপালের

দুদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এবার বাড়ি যাওয়া দরকার। কিন্তু এই মুহূর্তে নেহাকে ফেস্ করতে একবিন্দুও ইচ্ছে নেই তার। সেলফোনটা বার করে মাকে ফোন করল।

'মা, আমি ভাবছিলাম আজ রাতটা তোমাদের কাছে এসে থাকব। কোনও অসুবিধে নেই তো?'

'কে, জিৎ? ও মা — সে তো খুব আনন্দের কথা, অসুবিধের কথা ভাবলি কী করে? নেহা বুঝি কাজে বাইরে গেছে?'

'হ্যাঁ। আমি এই এক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।' বলে সেল ফোনটা বন্ধ করে তার নিজের বাড়িতে ল্যান্ডফোনে একটা ম্যাসেজ রেখে দিল এই বলে যে ও দু-দিনের জন্য বাবা-মার কাছে যাচ্ছে। প্রসেনজিৎ জানে ও নেহার ব্যাপারে তার ডিসিশনটা পস্টপোন করছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ও আর অন্য কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছে না।

পরদিন খুব সকালে নেহার ফোনের আওয়াজে জিতের ঘুম ভাঙ্গল।

'কী ছেলেমানুষি করছ! বাড়ি এসো। উই নীড টু টক।'

'আমি অফিসের পর আসব।' বলে প্রসেনজিৎ মোবাইলের খাপ বন্ধ করল।

***

তারপর এক বছর কেটে গেছে। প্রসেনজিৎ আর নেহার একটি ছেলে হয়েছে। জিতের কাজে অনেক উন্নতি হয়েছে এবং সে আজকাল অফিসের কাজে প্রায়ই দিল্লি, মুম্বাই ও ব্যাঙ্গালোর ঘুরে বেড়ায়। নেহার লিগেল প্র্যাক্টিস আগের মতোই চলছে। একজন ইংরেজি জানা আয়া তাদের ছেলেকে দেখাশোনা করে। প্রসেনজিৎ নেহার কমিটমেন্ট নিয়ে আর মাথা ঘামায় না, নিজেই বরঞ্চ সুযোগ পেলে একটু আধটু নারীসঙ্গ উপভোগ করে। ইন্টারনেটের জগতে অজানা অচেনা নারীসঙ্গ লাভের সুযোগের তো অভাব নেই। তপনের সঙ্গে তার বন্ধুত্বটা নষ্ট হয়ে গেছে। নেহার সঙ্গে তপনের যোগাযোগ আছে কিনা সে খবর প্রসেনজিৎ জানে না এবং জানতে চায়ও না।

শাশ্বতী বসু

জেরাডেল-১৯

আজ ঘুম ভাঙতে বেশ অনেকটাই দেরী হয়ে গেছে নীলার। বিছানার পাশে রাখা ডিজিটাল ঘড়িটাতে চোখ পড়লো। সকাল প্রায় ন'টা। তার মানে আজ আর ওর সকালের খবরটা দেখা হবে না। সুদীপও অফিস চলে গেছে অনেকক্ষণ। মনের কোণায় যেন এক টুকরো মেঘ ভেসে এলো হঠাৎ করে। অবশ্য নীলার আজ ছুটি। সেটা ভাবতে ভাবতেই হালকা মনে উঠে পড়লো সে।

রোজকার মত উঠেই বিছানার ধারের জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকানো তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস। বাইরে তাকিয়ে চোখে পড়লো আকাশ যেন আজ হাতের কাছে নেমে এসেছে মেঘে মেঘে ছেয়ে। সূর্যদেবের দেখা নেই কোথাও। দূর দিগন্তের নিত্য দেখা পাহাড়ের সারি অদৃশ্য। কেমন একটা গুমোট। হাওয়া উঠলেই হয়ত বৃষ্টি নামবে। এই রকম আকাশ নীলার মন বড় খারাপ করায়।

মন ভাল করার উপায় খুঁজতে চা নিয়ে ও ব্যাক ইয়ার্ডের বারান্দায় এসে বসে। বারান্দাটি তিনদিক দিয়ে ঘেরা – মাথায় ছাদ। ছাদের তলার ধার ঘেঁষে কাস্ট আয়রনের সুদৃশ্য জাফরি কাটা ঝালরের ঘের। ঝোলানো টবে কিছু অর্কিড, পাতা বাহার ঝুলছে। বারান্দার দুদিকের শেষ প্রান্ত ধরে কাঠের তাকে তাকে সুদৃশ্য অর্কিড আর স্যাকুল্যান্ট। ধূসর রঙের দুটো বেতের সোফায় মোটা মোটা গদি আঁটা। তার একটাতে এখন আরাম করে হেলান দিয়ে নীলা আসীন। সামনে কফি টেবিল। তার ওপরে ধূমায়িত চায়ের কাপ, কিছু হালকা খাবারের ট্রে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নীলা অলস দৃষ্টি ভাসিয়ে দেয় তাদের প্রশস্ত ঘাসের লন ছাড়িয়ে আরও সামনে, যেখানে কংক্রিটের রিটেইনিং ওয়াল দৃষ্টিকে আটকে দিয়েছে।

রিটেইনিং ওয়াল – কারণ নীলাদের এই টিলার ঢালের উপরে তৈরি বাড়িটার পেছনের বাড়ীটা অনেক উঁচু ধাপে। সেই বাড়িটার জমি আটকানো হয়েছে এই দেয়াল দিয়ে। ওই দেয়ালের গা ঘেঁষে উঠে গেছে ফোটনিয়া আর বটলব্রাশের ঝাড়ালো গাছগুলো। দেয়ালের খানিকটা সামনের দিকে কিছুটা ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ডায়াসমা গুল্মের ঝোপ। কিছুদিন পরেই এই গাছ আলো করে খই রঙের ফুল .....

– আরে ওটা কি ?

রিটেইনিং ওয়ালে ঠেশ দিয়ে বটলব্রাশ আর ফোটনিয়া গাছের ফাঁকের নিচু জমিতে পড়ে আছে ... বেশ বড় আকারের ... অদ্ভুত ধূসর মাটি ছোঁয়া রঙ ... গোলাকার কিন্তু মাথার দিকটা চ্যাপ্টা ধরনের ... কি যেন একটা বস্তু। মেঘে ঢাকা দিনের ঝাপসা আলোয় ভাল করে দেখাও যাচ্ছে না এখান থেকে। সবুজ ঘন ঠাস বুনটের ডায়াসমার ঝোপ খানিকটা আড়ালও করে আছে জিনিসটিকে । নীলা হাতে ধরা চায়ের কাপ টেবিলে রেখে এগিয়ে যায় বস্তুটির দিকে। ডায়াসমার ঝোপ সরাতেই জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

– আরে এটা তো মনে হচ্ছে একটা কুমড়ো। নিতান্তই বাঙালি ...। না বাঙালি না ... নিতান্তই এই ক্যাঙ্গারু-দেশের খাঁটি কুমড়ো। বিশাল – প্রায় এক হাতের ব্যাস।

– কি করে এটা এখানে এলো ?

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওপর থেকে কেউ এটাকে সন্তর্পণে নীচে নামিয়ে দিয়েছে। ওপর দিকে তাকায় নীলা। এক মানুষ লম্বাটে রিটেইনিং ওয়াল ছাড়িয়ে দৃষ্টি আরও ওপরে ওঠে। রিটেইনিং ওয়ালের মাথা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে সমতল জায়গা বেশ খানিকটা। সেই জায়গা ছাড়িয়ে ফোটনিয়ার মাথাগুলো পৌঁছে গেছে আরও ওপরে যেখানে প্রতিবেশী চার্লির

বাড়ির সীমানার বেড়া। ফোটনিয়ার ঝাড়ালো মাথাগুলো দু বাড়ির মাঝখানের দৃশ্য-পথ আটকে কিছুটা আড়ালের কাজ করছে।

চার্লির সাথে যোগাযোগ করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। মনে হচ্ছে চার্লিই ওপর থেকে কুমড়োটা নামিয়ে দিয়েছে। ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরেই ফোনটা নিয়ে বসে যায় নীলা। ফোন করে সুদীপকে। রিং হয়েই যায়। তারপরেই অনন্যাকে পেয়ে যায় একবারেই। সব শুনে অনন্যা বলে – ঠিক আছে, ঠিক আছে – আমি আসছি এখনি। বলতে না বলতেই সুদীপের ফোন।

– বোম টোম নয়তো ? দেখেছো ঠিক করে ?

– হ্যাঁ রে বাবা। কুমড়োই ওটা – আমি সিওর।

– ঠিক আছে। তুমি একটা ফটো তুলে পাঠাও। আর খুব কাছে যেও না। দূর থেকেই তুলো। যুম করে দেখে নেব ক্ষণ ।

নীলার সেই সব করতে করতেই টেবিলে রাখা শেষ না করা কফির কথা মনে পড়ে যায়। সেদিকে এগোতেই দরজায় বেল। অনন্যা।

– চল চল আগে ব্যাপারটা দেখে আসি। তারপরে বসা যাবে খানিকটা। বলেই হ্যান্ড ব্যাগটা বসার ঘরের সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলে অনন্যা তড়বড়িয়ে ব্যাক ইয়ার্ডের দরজা খুলে সোজা এগিয়ে যায় অকুস্থলে। নীলা এগোয় তার সাথে।

– ও ইনি এখানে ? নিচু হয়ে একটু নিরীক্ষণ করেই অনন্যা চেঁচায় ।

– আরে এটা তো jarradale pumpkin। তোর মনে নেই ? ইস্টার শোতে লাস্ট ইয়ার এই কুমড়ো গুলো এসেছিল ? বলছিল না যে একটা গাছে মিনিমাম ১৯ টা মত হবেই হবে। এই একই রকম। টাচ ব্লু, গ্রে কালার কম্বিনেশন। আমরা হাসছিলাম দেখে। ঠিক যেন মনে হচ্ছিল মাটির তৈরি। এক একটা এই তোর এই মহারাজের মত।

বলে অনন্যা কুমড়োটির দিকে তর্জনী তোলে। নীলার মনে হোল তাইত ওরা তো এই ধরনের কুমড়োই দেখেছিল ইস্টার শোতে। কেন যে তার আগে একবারও মনে হোল না ? সত্যি এই জন্যই অনন্যাকে তার পদে পদে দরকার হয়।

– ওজন মনে আছে তোর? সেই মেলায় দেখা কুমড়োগুলোর – বলছিল প্রায় আট কিলো মত হয় – তাই না রে ? দেখিস এটাও ঠিক ওরকমই হবে। যা স্যুপ হয় না। দুর্দান্ত। রোস্টও করতে পারিস ... কিম্বা পাই ... অনন্যা তখনো বলে যাচ্ছে। নীলা ভাবছে এই এত বড় কুমড়োর কত কিলো স্যুপ করবে সে ? আর কতো রোস্ট? খাবেই বা কে ? সুদীপ তো কুমড়োকে পাত্তাই দিতে চায় না সবজি বলে। বলে ওটা ছাগল খায়। কেন ? সেটা অবিশ্যি আজো জানা হয় নি। নীলার কিন্তু বেশ লাগে যে কোন ফরমেই।

– তুই কিন্তু বেশ খানিকটা নিবি। নীলা বলে ওঠে।

– হ্যাঁ তো। নেবো। চিন্তা নেই।

ততক্ষণে ওরা ঘরে। নীলা কেটল অন করে। চা নিয়ে এবার বসবে ওরা। অনন্যা টিভির রিমোট হাতে তুলে নেয়। কুঁই কুঁই আওয়াজ শুনে ওদের আড্ডায় বাধা পড়ে। আলানা এসে দাঁড়িয়েছে। নীলার আদরের পুডল। নীলা ওর গলা চুলকে দেয়। এক লাফ দিয়ে আলানা দুজনের মাঝখানে। আড্ডা জমতে বেশী দেরী হয় না দু সখীর।

বিকেলে সুদীপ এলে কুমড়োর স্থান হয় কিচেন বেঞ্চে। ওজন হয় ন' কিলো তিনশো। ফটো ওঠে পটাপট। ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ হয়ে যায় আরও দ্রুততায়। ওজন দেখে সেখানে "ওয়াও" এর ছড়াছড়ি । তারপর কর্তন, বণ্টন, ও রন্ধন প্রণালী শেয়ার করণ ইত্যাদি চলতে থাকে বেশ কিছু দিন ধরে।

ইতিমধ্যে চার্লির সাথে দেখা নীলার। শুনল কর্তা গিন্নি ভুগছে সর্দি কাশি তে। মাঝখানে তো লরাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল বেশ কিছুদিন। তার প্রায় হুপিং কাশি ধরনের কিছু একটা হয়েছিল। তার জন্য বাড়ির ল্যান্ড লাইনে নীলা ওদের পায় নি। চার্লিও নাকি ভুগছে। নীলা অবাক হোল গ্রীষ্মর এই প্রচণ্ড চল্লিশ ডিগ্রী গরমে কি করে এরা সর্দি কাশিতে ভুগছে। গরম তো নয় যেন লু বইছে চারদিকে। চার্লি বলল কুমড়ো গাছটা নীলাদের রিটেইনিং ওয়ালের ওপরের জমিতেই হয়েছিল। কুমড়ো হয়েছিল প্রায় ১৯-২০ টা। সেই সময় নীলারা লং সারভিস এর ছুটি কাটাতে বাইরে। তাই কুমড়োর আধিক্যটা চার্লি আর লরাই সামলেছে। শেষতম কুমড়োটা চার্লিই নীলাদের বাগানে নামিয়ে রেখেছিল। ভেবেছিল পরদিন বলবে নীলাকে। কিন্তু লরাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকাতে সেটা আর হয়ে ওঠে নি।

ইতিমধ্যে আলানার ডাক শোনা যায় ভেতর থেকে। অনেকক্ষণ সে নীলাকে না দেখে চিৎকার করছে। নীলা ফেরার উদ্রেক করতেই চার্লি বলে

– গাসেরও শরীর খারাপ।

– কি হয়েছে ওর?

– ও সেদিন ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে। নাতির সাথে বল নিয়ে লোফালুফি করছিল। বল তাড়া করতে লাফ দিয়েছিল। সামলাতে না পেরে নীচে পড়ে যায়। ডাক্তার বলল পাঁজরের হাড় ভেঙ্গেছে।

শুনে নীলা চুপ করে থাকে। গাস ওদের কুকুর। বাড়ির পোষ্য সন্তানসম। তাদের কিছু হলে কেমন অনুভূতি হয় সেটা নীলার অজানা নয়। চার্লিকে বিদায় জানিয়ে নীলা ফিরে আসে।

সকাল এগারোটা। রোজকার মত চায়ের কাপ হাতে নিয়ে নীলা বাগানে গেছে। বাগানের বেঞ্চে গিয়ে সে এইসময় বসে। পাশের বাড়ির গিন্নী কোন সময় চলে আসে। কোন সময় সে একাই। কোনও সময় দূরের বন্ধুরা কেউ ফোনে। আজ অনন্যা আসতে পারে। বাগানের সতেজ গাছপালার সাথে কথা হয় নীলার এই সময়। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন গাছ তার বাগানে। এই সময় তার বাগানের একপাশে গাজর আর অন্য পাশে যুকিনি। গাজরের ঝির ঝিরে পাতায় হাত বুলিয়ে দেয় নীলা। ওরাও মাথা নাড়ে বুঝি। বুঝি বা খুনসুটি করে, হাসে। নীলা যেন সে রকমই বোঝে। সে যুকিনির কাছে এসে দাঁড়ায়। খুব সতেজ তরুণ আর ভর ভরন্ত লাগছে যুকিনিকে। বিশাল সবুজ পাতা গুলো আনেক দূর অব্দি ছড়ানো। গোড়ায় গোড়ায় ছোট ছোট যুকিনির মাথায় হলদে ফুল এসে গেছে এরই মধ্যে। নীলা সাবধানে স্পর্শ করে পাতা গুলি পরম মমতায়। আসন্ন প্রসবার মন্থরতায় পাতাগুলো মৃদু দোলে।

ফোন বেজে ওঠে হঠাৎ। অনন্যা। আসতে পারবে না আজ। লালির শরীর খারাপ। খারাপই শুধু নয়। ভীষণ খারাপ। লালি পাশের বাড়িতে গেছিল। বোধ হয় ওরাই মেরে পেছনের পা দুটো ভেঙ্গে দিয়েছে। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বাড়ি ফিরে লালির আর ওঠার ক্ষমতা ছিল না। অনন্যা এখন হসপিটালের পথে ... ফোন কেটে যায় । নীলা দেখে অদ্ভুত ভাবে আলানা ওর দিকে তাকিয়ে ... যেন সে ফোনের কথাবার্তা সব শুনতে পেয়েছে।

লালি অনন্যার বেড়াল। সন্তানহীন অনন্যার ভালবাসার একমাত্র জায়গা। নীলা স্তব্ধ হয়ে যায়। ও কি হাসপাতাল থেকে ফিরবে ? শুনেছে গাস, চার্লির কুকুর সেও বাড়ি ফেরেনি আর। চুপ করে নীলা বসে থাকে। সম্বিত ফেরে তার আলানার অদ্ভুত ডাকে । ব্যাপার কী ? কেউ কি এসেছে বাড়ির দরজায় ? নীলা তাড়াতাড়ি বাগান থেকে উঠে পড়ে। ঘরে ঢুকে সে আলানার কাছে এগিয়ে আসে। আলানার চোখে অদ্ভুত একটা ভয়ার্ত কিন্তু সজাগ দৃষ্টি। কান দুটো খাড়া। সামনের দু পা সামান্য দুদিকে ছড়িয়ে মাথাটা নামিয়ে সে যেন কিসের প্রতীক্ষা করছে। কী দেখল আলানা ? কী ? যেটা নীলা দেখছে না। নীলা ঘরের ভেতরের চারদিকে ভাল করে দেখে। তারপর দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায় ।একটা গরম ভাপের ঝাপটা মুখে এসে লাগে।

স্তব্ধ গ্রীষ্মদুপুরের নির্জনতা চারদিকে। কোথাও একটা প্রাণীও চোখে পড়লো না নীলার। সামনের রাস্তার ওধারে কিছু

দূরেই শুরু হয়েছে জাতীয় অরণ্যের জঙ্গল, দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল গাম ট্রি। তাদের কারো একটি পাতাও নড়ছে না। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ তারা – যেন ওরাও নীলার মত কিছু একটা সন্দেহ করছে। যেন কিছু একটা হবে এখনই ... বা কেউ আসবে ... কেউ ... অবাঞ্ছিত, অচেনা কেউ ...।

আলানা এখনো ঘরের ভেতরই দাঁড়িয়ে। তেমনি ভীত। এতক্ষণে নীলারও কেমন একটা অস্বস্তি হয় কী একটা কথা মনে হওয়াতে। কী একটা অস্পষ্ট সন্দেহর সূক্ষ্ম খোঁচা ... মাথায় ...। যারা যারা কুমড়ো খেয়েছে তাদের পোষ্যদের ... ! ভাবতেই একটা বিদ্যুতের চমক ওঁর শিরদাঁড়া থেকে পা অব্দি বয়ে যায়। নীলা কেঁপে ওঠে আমূল। যেন মাথা থেকে এ অদ্ভুত চিন্তাটা সরাতেই অহেতুক ব্যস্ততায় নিচু হয়ে আলানাকে জড়িয়ে ধরে ও। আলানা ওর গাল চেটে চেটে দেয়। ফিরে আসে স্বভাবে।

আজ আবার অনেক দিন পর বাগানে এসেছে নীলা। ইতিমধ্যে দিনগুলো ভাল যায় নি তার। মাঝখানে এমন বৃষ্টি হোল যে স্বাভাবিক জীবন প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। কোন এক দৈব কারণে নীলাদের বিদ্যুৎ ছিল। কিন্তু পাশের গলি থেকে শুরু করে অনেকটা অঞ্চল জুড়ে সেটা ছিল না। বন্ধু বান্ধবরা অনেকেই নীলাদের ফ্রিজারে ফ্রজেন খাবার রেখে গেছিল। বড় বড় সুপার মার্কেট গুলোও এই বিপর্যয় এড়াতে পারে নি। তাদের ঠাণ্ডা রাখার মেশিন গুলো বন্ধ হয়ে গেছিল। আরও খারাপ যেটা হয়েছে সেটা হোল আচমকা নীলাদেরও বিদ্যুৎ চলে গেছিলো পরে। সবার জিনিস নষ্ট হোল বিশাল ভাবে। মর্মান্তিক যেটা হয়েছে লালিকে বাঁচানো যায় নি। অনন্যা চুপ হয়ে গেছিল। এখন ধীরে ধীরে আবার জীবন স্বাভাবিক হচ্ছে। অনন্যাও।

– আরে ! ওগুলো কি গাছ ?

চায়ের কাপটা গার্ডেন বেঞ্চে রেখে নীলা বাগানের দিকে এগোয় যেখানে যুকিনি আর গাজরের বেড একটা সমকোণ তৈরি করেছে। আরে ! এযে কুমড়ো গাছ দেখছি ...। একটা নয় – দু দুটো। একটা যুকিনির দিকে আর একটা গাজরের দিকে। অনেকটা বড় হয়ে গেছে। বড় বড় পাতা। ঘন সবুজ। তাতে রুপোলী রেখা শিরা উপশিরা হয়ে পরিস্কার সবেগে উপরের দিকে উঠে গেছে। আলো থেকে শুষে নিচ্ছে তার প্রাণশক্তি। তীব্র একাগ্র গতিতে। সে শক্তিতে প্রতিটি পাতার গোড়ায় গোড়ায় ফুলের কুঁড়ি আর নতুন পাতার উন্মেষ । ঊর্ধ্বমুখী, অসম্ভব স্বাস্থ্যে ভরপুর প্রাণবন্ত গাছ দুটো।

– কী করে হোল ? আমি কী এ গাছ লাগিয়েছি ? কী করে এগুলো এখানে এলো ?

তখনই মনে পড়ে যায় নীলার। চার্লির কুমড়োর বিচি গুলো ও এখানেই রেখেছিল পাখিদের উদ্দেশে। যদি খেয়ে যায়। ওঃ তার থেকেই ... ?

হাওয়া উঠেছে হঠাৎ। বেশ জোরে। রাস্তার ধারের গাম-ট্রি গুলো থেকে হাওয়া এসে নীলার ফুলের বেডের এর ভিতর দিয়ে সর সর করে বয়ে এসে এলোমেলো করে দিয়ে গেলো নীলার চুল, বসন, কুমড়োর পাতাগুলো ...।

খিল খিল ... খিল খিল ... খিল খিল ...। নীলা স্পষ্ট শুনতে পেল যেন দুটো শিশু একসাথে হেসে উঠল ।

ভেতরে ঠিক তখনই আলানা চিৎকার করে উঠল ভয়ার্ত গলায়।

Saswati Basu — Profession: University Teacher in Economics, lives in Sydney. I enjoy this beautiful life thoroughly. Particularly I enjoy listening to songs, reading books on sociology, short stories, and travelling around. I love watching drama, good cinema and tennis. I also love to experiment with new cooking recipes and share them with our friends. Believe in donating money to voluntary organisations for the people in need.

প্রশান্ত চ্যাটার্জী

একাদশতম পর্ব: বিয়ে-উধমপুর-পিতৃবিয়োগ-নগরোটা-ডিসচার্জ

পর্ব ১১

চিরকালই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বড় বলি হন উলুখাগড়ারাই। যুদ্ধে যেমন সীমান্তের আশেপাশের বাসিন্দারা। পাশের পাড়ার ছোট্টবেলার খেলার সাথীকে রাতারাতি বিদেশী তকমা লাগিয়ে নিষেধের বেড়া দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হয়। বা সহস্র সম্ভাবনাময় একদল যুবককে হঠাৎই মারা পড়তে হয় যারা হয়তো কেবল পরিবারকে একটু ভাল রাখবে বলে অন্য উপায় না পেয়ে সেনাবাহিনীতে কেবল চাকরি করতে এসেছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের এই দ্বিতীয় রকম উলুখাগড়ার দলেই একজন ছিলেন প্রশান্ত চ্যাটার্জী। যিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফিরেছিলেন। তাঁর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক প্রকাশ এই উলুখাগড়ার দিনলিপি। আজ একাদশতম পর্ব।

অনেকদিন আগে থেকে বাবা-মায়ের চাপ ছিল দাদা ও ছোটদির উপর যাতে আমি বিয়েতে রাজি হই। কিন্তু আমি বিয়ে করব কি করে ! যা মাইনে তাতে বিয়ে করে খাওয়াবো কি ? সেইজন্য যতবারই এই ব্যাপারে কথা হয়েছে আমি না করে দিয়েছি। কিন্তু বাধ্য হয়ে বিয়েতে রাজি হই। বাবার একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আমাদের বাড়ি শেষ নৌকো যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, মানে বড়দা বড় বৌদি যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, তখন বাবা-মা যথেষ্ট অসহায় অবস্থার মধ্যে ছিল। তা সত্ত্বেও তারা বাড়ি ছাড়ল। আমি তখন গোপালনগর বাড়িতেই ছিলাম। আগে থেকে প্রস্তুতি চলছিল আমরাও বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা ঘটবে। মা তখন চোখে দেখতে পেতেন না। অন্ধ মা আর বুড়ো বাবা বাড়িতে রইল আর আমরা ভালো ছেলেরা নিজের সুবিধার জন্য বাড়ির বাইরে চলে গেলাম। তখন অবশ্য নেদার বিয়ে হয়েছে। নেদা ও বেলা বাড়িতে আছে। বেলা বাবা-মাকে যথেষ্ট যত্ন করত। বড়দা বাড়ি ছাড়ার পর তখন আমার মনে হয়েছিল যে আমার বিয়ে করা দরকার। বিয়েতে আমি রাজি হলাম। দাদা, ছোটদিকে বললাম, তোমরা দেখাশোনা করো তবে গরিব ঘরের মেয়ে হওয়া চাই যার কোন বিশেষ চাহিদা থাকবে না। যাই হোক, ছোটদি এবং দাদা আর ছোটদা দেখাশোনা করে আমাকে জানাল এবং একটা ছবি পাঠাল। ছবি দেখেছিলাম কিন্তু সরাসরি বিয়ের আগে দেখিনি। ২৬ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ সালে আমার বিয়ে হয়ে গেল। বাবা মা খুশি হলেন। সাথে সাথে দাদারাও খুশি। বিয়ের পর দেখলাম বাড়ি ঢোকার আগে রাস্তাতে দাঁড়িয়ে বাবা, মায়ার হাতে দামোদর গোপাল ধরিয়ে দিলেন – "এই দায়িত্ব তোমার হাতে দিলাম, তুমি এদের দেখাশোনা কোরো।" বাবা আমার হাতে না দিয়ে মায়ার হাতে ঠাকুরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বাবা ঠিক লোকের হাতেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সে দায়িত্ব আজও নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে নিজের অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও, আজও ঘর বন্দী হয়ে আছে।

তবে বিয়ে করে একটা উপকার হয়েছে। মায়ার মত এত ভালো মেয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছে। মুন্নির মত এত ভালো মেয়েকে আমরা পেয়েছি। সাথে সাথে পিনাকীর মত এত ভালো ছেলেকে জামাই হিসাবে আমরা পেয়েছি। ধন্যবাদ দাদা, ছোটদিকে। বিয়ে না করলে আমি কোথায় ভেসে বেড়াতাম।

এবারের পোস্টিং ৪৫৬ সিগন্যাল রেজিমেন্টে হয়েছে। আসার আগে ১২ দিনের ব্রেক জার্নি পেয়েছিলাম। আবার বাড়ি গেলাম। সকলের সাথে দেখা হল। সামান্য দু'চার দিন বাড়িতে ছিলাম। বেশ আনন্দে কেটেছিল। আসার দিন বাবা আমাকে রিক্সা ডেকে নিয়ে এসে তুলে দিলেন। রিক্সাকে বললাম ছেড়ে দিতে। দাঁড়িয়ে থাকলে সকলেই কাঁদতে থাকবে। রিক্সা ছেড়ে বেরিয়ে গেলে মাঝে একবার পিছন ফিরে তাকালাম। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, মা দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করছেন। মায়ারও একই অবস্থা। সেদিন জানতাম না আজই আমার বাবার সাথে শেষ দেখা হল। এরপর আর কোনদিন বাবার সাথে দেখা হয়নি।

আমি উধমপুরে পৌঁছানোর পর আমাকে নিউ অ্যারাইভাল সেকশনে রাখা হল। উধমপুরে ব্যারাক গুলো দোতলা। আমরা উপরের তলায় ছিলাম। কোন জায়গায় পোস্টিং হবে কে জানে। হেডকোয়ার্টারটা এখানে Nagrota-র একটা সেকশন আর শ্রীনগরের শংকরাচার্য মন্দিরের সাথে একটা কোম্পানি। আমার ইচ্ছে করে একবার যেতে পারলে ভালো হয় তাহলে ওখানটা দেখা হয়ে যাবে। এখানে এসে গেছি যখন যাব ঠিকই। সকালে পিটির জন্য দোতলায় দাঁড়িয়ে আছি, নিচে দেখলাম পিটি ড্রেসে মেজর উপাধ্যায় গ্রাউন্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম এঁনার নাম কি। সে ওখানকার পুরনো লোক, আমি তো এখানে একদমই নতুন। সে বলল ওঁনার নাম মেজর উপাধ্যায় এবং উনি এখানকার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। মনে মনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। কারণ ওনার সাথে আমার ভালই আলাপ আছে। ভালো লাগছে এটা চিন্তা করে নতুন ইউনিটে একজন বড় অফিসার আমার খুব পরিচিত। যদিও আমি কোনো সুযোগ নেয়ার পক্ষপাতী নই। ওনার সাথে আজ দেখা হলো না। পরের দিন সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। একজন এসে খোঁজ করছে নিউ অ্যারাইভালে হাবিলদার চট্টোপাধ্যায় কে আছে, তাকে অফিসে ডাকছে। সকালবেলা পিটি ড্রেসে অফিসে গেলাম। অফিসে যেতেই ডিউটি ক্লার্ক আমার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বাইরে চলে গেল। কাগজটা পড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে ইংরেজির কোন শব্দই আমি চিনি না, বুঝি না। দুবার, তিনবার পড়লাম। তবু মনে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার অবস্থা দেখে ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করল, যে টেলিগ্রাম করেছে তাকে তুমি চেনো কি না। আমি বললাম হ্যাঁ চিনি উনি আমার দাদা হন। টেলিগ্রামে লেখা আছে "ফাদার এক্সপায়ার্ড অন ফিফটিন্থ নাইট, কাম শার্প – ফটিক।" একটু ধাতস্থ হবার পর JCO in charge-এর সাথে দেখা করলাম। নতুন কোন ইউনিটে গেলে ডকুমেন্টেশন হয়। সেটা আমার এখনো হয়নি। চিন্তায় ছিলাম হয়তো ছুটি দিতে দেরি করতে পারে। JCO আমাকে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড এর কাছে নিয়ে গেলেন। সেই মেজর উপাধ্যায়, উনি আমাকে দেখে চিনতে পেরেছেন। কিন্তু তিনি সেটা প্রকাশ করলেন না। টেলিগ্রামটা দেখে বললেন কলকাতায় অনেকদিন কাজ করে এসেছি, তোমাদের ১২ দিনে কাজ হয় জানি। ১২ দিনের মাত্র ছুটি দিলাম, তাতে তোমার কাজ হয়ে যাবে। ফিরে এসে আমি যেন ওঁনার সাথে দেখা করি। JCO-কে বললেন স্টেশন যাওয়ার জন্য যেন গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন টাকা দরকার আছে কিনা, তাহলে ব্যবস্থা হবে। আমি বললাম টাকা আমার কাছে আছে, লাগবে না। আবার উনি বললেন বাড়ি থেকে ফিরে যেন ওঁনার সাথে দেখা করি। ১২ দিনের ছুটি নিয়ে আবার বাড়ি চললাম।

কোলাঘাট স্টেশনে সেজদা সেজ বৌদির সাথে দেখা হয়ে গেল। বাড়ি পৌঁছানোর পর মা আমাকে জড়িয়ে খুব কান্নাকাটি করল। মায়া আমাকে বলল "আমি তোমাদের বাড়িতে আসার পর বাবা মারা গেলেন, আমি অপয়া।" জানিনা কেউ তাকে কথা বলেছে কিনা। আগেকার দিনে এরকম সংস্কার ছিল। যাইহোক নির্দিষ্ট দিনে বাবার কাজ হল। আমরা ছয় ভাই থাকা সত্ত্বেও, সকলে ভালো-খারাপ চাকরি করি, তা সত্ত্বেও, বাবার কাজে মাটির সরা ব্যবহার করা হয়েছিল। সাধারণভাবে পিতল বা কাঁসা ব্যবহার করা হয়। আমাদের নাকি সামর্থ্য ছিল না। মা তো চোখে দেখতে পেতেন না। আন্দাজে বলেছিলেন তোদের লোকের মানে তোদের বাবার যেভাবে কাজ হচ্ছে আমার বেলায় সেরকম করবি তো ? একটাই শান্তি মা মনে করছে বাবার কাজ খুব ভালোভাবে হয়েছে। সব কাজ হয়ে যাবার পর আমার চিন্তাটা আরো বেড়ে গেল। এতদিন বাবা মাথার উপর ছিলেন। এবার সংসার দেখাশোনা কে করবে। আমারতো টাকার জোর ছিল না। আমি যে টাকা পাঠাতাম তার সাথে ছোটদা ও দাদা কিছু টাকা দিতো সংসার চলার জন্য। খুব চিন্তা নিয়ে ছুটি শেষ করে আবার উধমপুরে ফিরে গেলাম। অনেক পরে জানতে পারি, সংসার খরচের হিসাব লেখার জন্য মায়াকে একটা খাতা দেওয়া হয়েছিল। সব খরচ যেন লিখে রাখা হয়। কোন এক জামাইবাবু মায়ের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, তার জন্য একটা ডিম কেনা হয়েছিল, যথারীতি সেটা খাতায় লেখা ছিল। পরে কেউ খাতা দেখে জানতে চেয়েছিল ডিমটা কেন এসেছিল। মনে হয় নিজের ইচ্ছে মত খরচ করার ক্ষমতা ছিল না মায়ার।

উধমপুরে পৌঁছে মেজর উপাধ্যায়ের সাথে দেখা করার কথা। আমাকে উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ডেকে বললেন হেডকোয়ার্টারে কোন টেকনিক্যাল কাজ নেই। বাজে কাজে লাগিয়ে রাখবে তোমাকে। তবে খেলার সুযোগ টা এখানে পাবে। আমার ইচ্ছা তুমি নগরোটাতে একটা কোম্পানি আছে, সেখানে যাও। ওখানে টেকনিক্যাল কাজ আছে, এও বলে

রাখছি। যদি কোনো অসুবিধা হয়, আমাকে জানাবে। আমি তোমাকে তুলে নিয়ে আসব এখানে। ওখান থেকে আমাকে নগরোটাতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আবার নতুন জায়গা।

নগরোটা যাওয়ার আগে উধমপুরে একটা জিনিস দেখলাম। ওখানে সেলে একজন বন্দি ছিল। সেও ওই সিগন্যাল রেজিমেন্টের লোক। প্রতিদিন সকালে সেই বন্দিকে ফুটবল মাঠে ঘোরানো হত কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায়। জানতে পারলাম তার কোর্টমার্শাল হবে। অপরাধ ভীষণ গুরুতর। সে ভারতের নাগরিক। ভারতের কোন মেয়েকে সে বিয়ে করেছে। কিন্তু ওই লোক সুযোগ বুঝে ভারতের বিরুদ্ধে নানারকম কাজ করে যাচ্ছে। পাকিস্তানকে সব রকম খবর দিত যখন সে ছুটিতে থাকত। সম্ভবতঃ টাকার জন্য এইসব কাজ করত। কোনো বিশেষ দলের সাথে যুক্ত ছিল। তার স্ত্রী অনেকভাবে চেষ্টা করেছে যাতে এইরকম কাজ না করে। কিন্তু কোনভাবে বাগে আনতে পারে নি। তখন বাধ্য হয়ে ৪৫৬ সিগন্যাল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয় যে আমার স্বামী এইরকম কাজে যুক্ত, আমি চেষ্টা করেও কিছু করতে পারি নি। আপনি যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিন। এনকোয়ারি করে জানা যায় কথাটা সত্যি। সেই থেকে সে বন্দী হয়ে আছে। সপ্তাহে দু'দিন তার স্ত্রী দেখা করতে আসত। কিছুদিনের মধ্যে উধমপুর থেকে আমি নগরোটা চলে যাই। ওই বন্দীর কি শাস্তি হয়েছিল জানি না।

নগরোটায় আমাদের থাকার জায়গাটা একটা নদীর ধারে। গরমকালে নদীটা প্রায় শুকনো থাকত। ওখানে পাকা ব্যারাক ছিল। আবার তাঁবুও ছিল। তাঁবুতে ২৫+২৫ জন করে ৫০ জন থাকার ব্যবস্থা ছিল। বিরাট তাঁবু। নগরোটা জম্মু থেকে খুব দূরে নয়। আমরা মাঝে মাঝে আউট পাস নিয়ে জম্মু বেড়াতে যেতাম। ওখানে থাকা অবস্থায় দাদা চিঠি দিল, পাঞ্চেত থেকে ডিভিসি পার্টি বেড়াতে যাচ্ছে, মায়া কে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়, আমার আপত্তি আছে কি না। দাদাকে টাকার ব্যাপারটা কি হবে জানতে চাইলাম। দাদা বললো টাকা লাগবে না। যা লাগবে দাদা দিয়ে দেবে। দাদা, বৌদি কুমু, রানা ও মায়া বেড়াতে গেল। ডিভিসি টিমের সাথে। মাঝে ওদের কম্পার্টমেন্টে কিছু স্প্রে করে অনেক কিছু চুরি করে নিয়ে গেল। দাদারও টাকা চুরি হয়ে গেছিল। দাদাকে গোপন করে বৌদি আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, যদি সম্ভব হয় কিছু টাকা ব্যবস্থা করে আমি যেন জম্মু স্টেশন ইয়ার্ডে ডিভিসি কম্পার্টমেন্ট থাকবে সেখানে ওদের সাথে দেখা করি। আমার কাছে সামান্য কিছু টাকা ছিল, আরও দু'জনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে, নির্দিষ্ট দিনে জম্মু গেলাম। ওই কম্পার্টমেন্ট খুঁজে পেলাম। দু'তিনজন ওই কম্পার্টমেন্টে আছে। জিনিসপত্র পাহারা দিচ্ছে। বাকি লোকেরা মানে দাদারা, তারা সকলে শ্রীনগর চলে গেছে। নানাভাবে খোঁজ নিয়ে জানলাম আমি ঠিক জায়গায় পৌঁছেছি। ওটাই পাঞ্চেত ডিভিসি টিমের কম্পার্টমেন্ট। দেখলাম মিলিটারি ত্রিপলের তৈরী একটা ব্যাগ বাড়িতে ছিল, সেই ব্যাগটাও ওখানে আছে। মায়া ওই ব্যাগটা নিয়ে গেছে। যখন বুঝতে পারলাম এটাই ঠিক পাঞ্চেত এর গাড়ি, তখন সেখানে যে তিন-চারজন ছিল, তাদের একজনের হাতে কপাল ঠুকে ওই টাকাটা দাদাকে চিঠি লিখে দিয়ে এলাম। বলে এলাম এই টাকাটা যেন অমিয় চ্যাটার্জি কে দিয়ে দেয়। যবে তারা এখানে ফিরবে।

ওই সময় আমি তাঁবুতে থাকি। ভোরবেলা ৫০ জনের মশারী টাঙ্গানো অবস্থায় সে এক দেখার ব্যাপার হত। দাদাদের জম্মুতে ফেরার দিন আবার আউট পাস নিয়েছি ওদের সাথে দেখা করতে যাবো বলে। সকালে আমি তৈরি হচ্ছি বেরোবো বলে, সেটা আজ ছুটির দিন ছিল। সকলে শুয়ে আছে। আমি জম্মু যাব বলে মশারি খুলে ঠিক করছি। হঠাৎ দেখি দাদা, লম্বা মানুষ, ওই মশারির জঙ্গলে মাথা নিচু করে আমার বিছানার দিকে এগোচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি একজনকে মেসে চা আনতে পাঠিয়ে দিলাম। দাদা বললো তৈরি হয়ে বেরিয়ে আয় আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। কুমু ও রানার জন্য ক্যান্টিন থেকে বিস্কুট আর চকলেট নিয়েছিলাম। বাইরে গিয়ে দেখি একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তাতে ড্রাইভার বাদ দিয়ে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। আর গাড়ির পিছনে মায়া বসে আছে। দাদা ও সেই ভদ্রলোক ড্রাইভার এর সাথে আগে বসল। খুব আনন্দ হচ্ছে ওদের সাথে দেখা হতে। তখন তো মোবাইল ফোন ছিল না। তাই এত ঝামেলা করতে হয়েছে। দাদা মনে করেছিল যদি কোন কারণে আমি বাইরে যাবার সুযোগ না পাই, তাই মায়াকে গাড়িতে করে নিয়ে এসেছে আমার সাথে দেখা করিয়ে দেবে

বলে। গেটে যে গার্ড আছে তাকে বলে ঢুকে এসেছে। ছোট ইউনিট সকলের সকলকে চেনে। বড় ইউনিট হলে গাড়ি নিয়ে একেবারে ব্যারাকের কাছে পৌঁছাতে পারতো না। দাদাদের জন্য চা আনতে পাঠিয়েছিলাম। ওদের তো চা খাওয়া হলো না। গাড়ি ছুটলো জম্মু স্টেশনের দিকে। আমি মায়া গল্প করতে লাগলাম। টাকার কথা জিজ্ঞাসা করতে দাদা বললো টাকা পেয়েছে। যাক মনে শান্তি হল। ওখানে পৌঁছে বৌদি, কুমু-রানার সাথে দেখা হল। ওরাও খুব খুশি। ওদের যে চুরি হয়েছে আমি জানলাম কি করে দাদা জানতে চাইল। বৌদির চিঠির কথা ফাঁস হয়ে গেল। সকলের সাথে বৈকাল পর্যন্ত খুব আনন্দে কাটালাম। ওদের ট্রেনও আজ ছেড়ে যাবে ওখান থেকে, আর আমাকেও ঠিক সময়ে ইউনিটে ফিরে যেতে হবে। দাদা বৌদিকে প্রণাম করে, কুমু-রানা আর মায়ার কাছ থেকে মন খারাপ করে বিদায় নিলাম। খুব খারাপ লাগছিল ফেরার সময়। তবুও এটা ভেবে আনন্দ হচ্ছে যে কম সময়ের জন্য হলেও দেখা হল। ইউনিটে ফেরার পর খুব বকাবকি খেলাম অনেকের কাছ থেকে। কেন দাদাদের চা না খাইয়ে চলে গেছিলাম। নগরোটাতে আমাদের থাকার জায়গাটা দাদা ও মায়া দেখে গেল।

শ্রীনগরে শংকরাচার্য মন্দিরের সাথে আমাদের একটা ছোট ডিটাচমেন্ট আছে। সেখানে একজন মেকানিককে টেম্পোরারি ডিউটিতে যেতে হবে। আমি ভলেন্টিয়ার হয়ে গেলাম। ওই জায়গাটা দেখে আসব বলে। শ্রীনগরটা ভালো হবে দেখা হয়ে যাবে। এখান থেকে গাড়ি যাবে। আমার সাথে আরও একজন অপারেটর যাবে। বিছানা বেঁধে বেড়িয়ে পড়লাম শ্রীনগরের জন্য। ওখানকার থাকার জায়গাটা একেবারে মন্দির-এর কাছে। ওখান থেকে পুরো শহরটা দেখা যায়। মন্দিরটাতো পাহাড়ের ওপর। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওখান থেকে শহরটাকে। সময় পেলে ডাল লেকের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। রাত্রের খাওয়া সন্ধ্যাবেলা খেয়ে পাহাড় বেয়ে ডাল লেক নেমে আসতাম। রাত্রি দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ আবার পাহাড় বেয়ে ইউনিটে ফিরে যেতাম। তখন শ্রীনগরে জঙ্গিদের ঝামেলা ছিল না। আমরা খুব আরামে ঘুরে বেড়াতাম। কোনো বাধা নিষেধ ছিল না। ছুটির দিনে শ্রীনগরের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। একবার outpass নিয়ে গুলমার্গ ঘুরে এলাম। ওহ, সে কি আনন্দ! শ্রীনগরে যে দেখার সব আস্তে আস্তে দেখা হয়ে গেল। কাশ্মীরি শালে যেখানে কাজ হয় সেই জায়গাটাও দেখে নিলাম। গুলমার্গে তখন অন্যরকম রোপওয়ে ছিল। এখন মানে আমি আবার যখন ১৯৯৭ সালে গিয়েছিলাম তখন দেখলাম অন্যরকম রোপওয়ে। ওখানকার রোপওয়েকে 'গন্ডোলা' বলে। ওখানকার মেন্ বাজার লালচক, তও দেখা হলো। শ্রীনগর দেখার কতদিনের ইচ্ছে। সেটা এতদিনে পূরণ হলো। মনে খুব আনন্দ হচ্ছে যে সকলকে বলতে পারবো আমি শ্রীনগর দেখেছি, ওখানে পোস্টিং ছিলাম। বাড়িতে মায়াকে চিঠি লিখতাম। তাতে মাকেও লিখতাম। বেশ আনন্দে ছিলাম। যে দুজন টেম্পোরারি ডিউটিতে গিয়েছিলাম তাদের নগরোটায় ডেকে পাঠালো। আমরা নগরোটা ফিরে এলাম।

ওখানে ফিরে দেখলাম এক নতুন উৎপাত। প্রতি সপ্তাহে কিছু লোককে রাইফেল ও FSMO (Field Service Marching Order) নিয়ে বৈষ্ণদেবী মন্দিরে পাঠানো হচ্ছে। যাদের হয়ে যাচ্ছে তাদের লিস্ট তৈরী হচ্ছে। কোনোভাবেই ফাঁকি দেওয়া চলবে না। নগরোটা থেকে কাটরা পায়ে হেঁটে। তারপর ওখান থেকে বৈষ্ণদেবী মন্দির। আবার একইভাবে ইউনিটে ফিরে আস্তে হতো। যাওয়ার সময় মেন্ রাস্তায় না হেঁটে, নালা-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে হতো যাতে রাস্তাটা কম হয়। কিছু ছেলের সাথে আমিও বৈষ্ণদেবী ট্যুর করে এলাম। আস্তে আস্তে সব ছেলেদের বৈষ্ণদেবী ট্যুর শেষ হলো। মনটা বেশ খারাপ হয়ে আছে। বাবা নেই, মা ও মায়া কিভাবে আছে কে জানে? সংসার চলার কতটা অসুবিধা হচ্ছে কে জানে? চিঠিতে তো কিছু লিখবে না। চিঠি আসতে বারো-তেরো দিন লেগে যায়। আবার আমি তার উত্তর দিলে সেটাও বারো-তেরো দিন নেবে। কত সময় লাগতো আগে। এখন ফোনের সুইচ টেপার সাথে সাথে লোকজনের সাথে কথা হয়ে যাচ্ছে।

একদিন নগরোটাতে কোম্পানি ওয়ার্কশপে কাজ করছি। খবর পেলাম উধমপুর থেকে সেকেন্ড ইন কমান্ড কোম্পানি ভিসিটে এসেছেন। সেই মেজর উপাধ্যায় সাহেব। ঠিক করলাম ডিসচার্জ যাওয়ার ব্যাপারে ওনার সাথে আজ কথা বলবো। অপেক্ষা করছি কখন উনি আমাদের এখানে আসেন। একসময় উনি এলেন, সাথে এখানকার OC আর senior JCO আছেন। সকলের সামনেই উনি জিজ্ঞাসা করলেন "চট্টোপাধ্যায় কেমন আছো ?" বললাম ভালো আছি কিন্তু বাড়ির ব্যাপারে

খুব চিন্তায় থাকি। বাবা মারা গেছেন সেটা উনি জানেন। ওঁনাকে খুব অনুরোধ করলাম যাতে আমার ডিসচার্জের ব্যবস্থা করা হয়। বাড়ি যাওয়া আমার বিশেষ দরকার। উনি বললেন, অনেকে অনেক হুজুগে ডিসচার্জ নিয়ে চলে যায়। তারপর সিভিলে গিয়ে কিছু পায়না। তখন অসুবিধায় পড়ে যায়। আমি একটু জোর দিয়ে বললাম, সেরকম কিছু হবে না। ডিসচার্জের ব্যবস্থা করুন স্যার। জানতে চাইলেন কতদিন চাকরি হয়েছে। বললাম পনের বছর শেষ হয়ে গেছে। নিয়ম আছে পনের বছরের একদিনও যদি কম থাকে তাহলে পেনশন পাবো না। তাই উনিই চাইছেন পনের বছর পুরো হয়ে গেলে তবেই যেন আমি দরখাস্ত করি। ওনাকে আমার ডেট অফ এনরোলমেন্টটা জানালাম। ঠিক আছে দরখাস্ত করো। দেখি কি করা যায়। আর সাথে সাথে নগরোটার OC কে বললেন, ভাল করে দরখাস্ত লিখে সই কর যেন উধমপুরে পাঠানো হয়। তরপর ওখান থেকে আবার স্পেশাল রেকমেন্ড করে আমার রেকর্ড জব্বলপুরে পাঠাবেন। এবার রেকর্ডের অফিসার ইন চার্জ বিবেচনা করবেন আমাকে ডিসচার্জ দেওয়া হবে কিনা। উনি বললেন, রেকর্ড অফিসারের সাথে আমার পরিচয় আছে। আমি আলাদা একটা চিঠি দেব ওঁনাকে। তোমারটা বোধহয় হয়ে যাবে। মনে মনে কি আনন্দ হচ্ছে বলে বোঝানো যাবে না। সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর উপাধ্যায় ওঁনার ইউনিট ভিসিট শেষ করে উধমপুরে ফিরে গেলেন। এবার এখানকার ওসি আর সিনিয়র JCO আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, মেজর সাহেবের সাথে আগে কোথায় ছিলাম ? আমার সাথে কিভাবে আলাপ ? সবকিছু বললাম। ওঁনারাও বললেন, তোমারটা বোধহয় হয়ে যাবে। সেকেন্ড ইন কমান্ড চলে যাবার পর বোধহয় এখানকার ওসি আর সিনিয়র JCO-র কাছে আমার কদর কিছুটা বেড়ে গেল। মায়াকে চিঠি লিখে জানালাম পুরো ব্যাপারটা। তিন চার দিনের মধ্যে আমার চিঠিটা তৈরী করে উধমপুরে পাঠানো হলো। এবার শুধু অপেক্ষা করা কি চিঠি আসে। একটু চাপেও পড়ে গেলাম। ডিসচার্জ হয়ে গেলে যে সামান্য পেনশন পাবো তাতে সংসার চলবে তো ? আবার মনে মনে ভাবছি, যা হবে হবে। বাড়ি যাওয়া চাই। মোটামুটি একটা আনন্দে কাটছে। মায়ার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে, সেও খুশি বাড়ি যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে জানতে পেরে। সম্ভবত দুই-আড়াইমাস পরে নগরোটায় চিঠি এলো যে আমার ডিসচার্জ মঞ্জুর হয়েছে। পনের-কুড়ি দিনের মধ্যে জব্বলপুর যেতে হবে। বাড়িতেও জানিয়ে দিলাম পুরো ব্যাপারটা। তারাও সকলে খুশি। নগরোটাতে পার্টি আরম্ভ হলো। এটাই নিয়ম। কেউ বাড়ি গেলে তাকে সকলে পার্টি দেয়। কয়েকজন বাঙালি ছিল তারা আলাদা পার্টি দিলো। সেকশন থেকে একটা হলো। তারপর নির্দিষ্ট দিনে আমাকে একটা ওয়ান টনে তুলে দেওয়া হলো জব্বলপুরে যাওয়ার জন্য।

ঠিক সময়ে জব্বলপুর রেকর্ডে গিয়ে রিপোর্ট করলাম। অনেক ছেলে এখানে আছে। সকলে মিলিটারি জীবনকে বিদায় দিয়ে স্থায়ীভাবে বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করার জন্য এসেছে। সকাল আটটায় ব্যারাক থেকে বেরিয়ে যেতাম। রেকর্ড অফিসের বিভিন্ন ক্লার্কের কাছে গিয়ে আমার কাগজপত্র ঠিক করতাম। যাতে পেনশন বা সিভিলে গিয়ে অন্য কোনো চাকরি পাবার অসুবিধা না হয়। বেলা একটার আগে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম, আবার বৈকাল চারটেয় অফিস। সন্ধ্যেবেলা খাবার পর বা ছুটির দিন জব্বলপুরের পুরোনো জায়গা মানে 1 MTR (Millitary Training Regiment), 1 TTR (Technical Training Regiment) বা 1 STC (Signal Training Centre) এসব জায়গায় ঘুরে আসতাম। আগে এখানে কত ঘুরেছি। ফুটবল খেলেছি। চিরকালের জন্য এ'জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। একটু মন খারাপ হচ্ছে। আবার আনন্দও হচ্ছে এই ভেবে যে এইবার আমার বাড়ি ফেরার রাস্তা পরিষ্কার হচ্ছে। বোধহয় পনের-ষোলো দিনে ওখানকার কাজ শেষ হল। কিছু বাঙালির সাথে আলাপ হল। তারাও ডিসচার্জের জন্য এসেছে। বিশ্বাস বলে একটি ছেলে, তার EFS (Electrical Fitter Signals) tread, সেও আমার সাথে কাজ শেষ করেছে। সম্ভবত একসাথেই বোম্বেমেল ধরতে পারবো। যে বোম্বেমেলে করে প্রথম চাকরি করতে এসেছিলাম, সেই বোম্বে মেলেই চাকরি শেষ করে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আমার ডকুমেন্টেশন এর কাজ শেষ। এবার যে কোনোদিন বাড়ি ফেরার টিকিট দিয়ে দেবে। ১৯৬২ সালে জব্বলপুরে ট্রেনিং আরম্ভ হয়। ট্রেনিং শেষে ঝাঁসিতে প্রথম পোস্টিং। 1st Armd. Div., Sig. Regt.-এ। তারপর অনেক ইউনিট পেরিয়ে শেষ ইউনিট ছিল Northern Command, Signal regiment., নগরোটা। ওটাই আমার শেষ ইউনিট। সিগন্যাল রেকর্ড জব্বলপুর থেকে দোসরা নভেম্বর, ১৯৭৮ আমাকে ডিসচার্জ দেওয়া হয়। মেজর উপাধ্যায়কে মনে মনে স্যালুট করে বিদায় নিয়েছিলাম। ওঁনার জন্যই অত তাড়াতাড়ি ডিসচার্জ পেয়েছিলাম।

এত বছর আগে মিলিটারি থেকে চলে এসেছি। সবকিছু ঠিকঠাক মনে নেই। যা মনে আছে তাই লিখলাম। পনের বছর দুশো সাতষট্টি দিন মিলিটারিতে চাকরি করে মোট এগারো হাজার ছয়শ চল্লিশ টাকা পাওয়া গেলো। এখন একথা শুনে কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এটাই সত্যি। আর পেনশন ঠিক হয়েছিল মাত্র একশ তেতাল্লিশ টাকা। এই নিয়ে দুই-তিন দিনে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এলাম। একটা অনিশ্চিত জীবনে। আনন্দ এবং ভয় নিয়ে। দোসরা নভেম্বর, ১৯৭৮-এ শেষ হল মিলিটারি চাকরি জীবন।

(শেষ)

Prasanta Chatterjee — 76 years. Retired from Indian army on 1978. Later worked at Indian postal service. Retired on 2001. Passionate footballer. Played for Indian army team. Stays at Gopalnagar, Kolaghat, East Midnapore, West Bengal, India.

BALCONY

The English publication from Batayan group
April 2021

Inaugural issue of Balcony now available for purchase as a Digital Download !!

Over the years, Batayan has always sought to include contributions in both English and Bengali, making it a truly multicultural and a uniquely cross-lingual magazine. The popularity of the English Section of Batayan has soared over time, so much so that we are now proud to announce the inaugural issue of Batayan's entirely English edition – "Balcony".

This very special first edition of Balcony has been lovingly put together by our guest editor Prof. Krishna Sen, from Perth, Western Australia.

We are proud to feature contributions from indigenous and first nation writers such as Alf Taylor and Robert Mast there are stories, poems, travelogues, essays and a very special translations from Srijato's "*Tara bhora akasher niche*" – "Under the starry sky".

We are offering digital pdf download of this edition for a nominal fee of US$3.00.

Please follow the link below to purchase and download the digital copy and support Batayan's new venture – Balcony.

https://payhip.com/b/xa4j

এক বাক্স চকলেট Batayan Inc প্রকাশনার নতুন বই নানা স্বাদের গল্প ও রম্যরচনায় জমজমাট

আপনার copy পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে ।
আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া সহ অন্যান্য দেশেও পাওয়ার ব্যবস্থা আছে ।
যোগাযোগের বিবরণ (কলকাতা) – সুব্রত মিত্র (৯৪৩২০৮৬৫৮৪) অথবা kajalneo@gmail.com